বাংলা

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম ভাষণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন -'বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি ।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

বাংলা

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর

জফির সেতু

ত ন ম জাকিয়া বারিরা

প্রণয় ভূঞাঁ

ফিরোজ আল ফেরদৌস

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

মামুন হোসাইন

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

আবাবিল যুল জালাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

প্রমিত বাংলা ভাষায় ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সপ্তম শ্রেণির বাংলা বই তৈরি করা হয়েছে। বইয়ের পাঠ-নির্বাচন ও পাঠ-বিন্যাস করার সময়ে এমন কিছু কৌশল ও কাজ যোগ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে তাদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে পারে। ভাষাদক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু শাখার সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বইয়ের মূল লক্ষ্য যেহেতু প্রমিত ভাষা শেখা, তাই বাছাই করা পাঠের মধ্যে কিছু শব্দরূপের পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণির বইটি প্রণয়নের সময়ে ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়েছে। এ বইয়ে কিছু অনুশীলনীর পুনরালোচনা আছে এবং কিছু নতুন আলোচনা ও কাজ যুক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা যাতে ক্রমান্বয়ে বাড়ে, সেদিকে লক্ষ রেখে সপ্তম শ্রেণির বইটি আগের শ্রেণির বইয়ের ধারবাহিকতায় রচিত। পাঠের সাথে শিক্ষার্থীর সংযোগ ঘনিষ্ঠ করতে বইয়ের নির্দেশনা ও ভাষা ব্যবহারে কথোপকথনের ভঙ্গি রক্ষা করা হলো।

পূর্ববর্তী শ্রেণির আটটি দক্ষতাকে খানিকটা উন্নীত করে এই শ্রেণিতে সেগুলো নিম্নরূপে সাজানো হয়েছে:

১. প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে মর্যাদা বজায় রেখে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা;

২. প্রমিত ভাষায় কথা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে সাবলীলতা অর্জন করতে পারা;

৩. বিশিষ্ট লেখকদের রচিত কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি বুঝতে পারা;

৪. শব্দ, অর্থ ও যতি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন গঠনের বাক্য রচনা করতে পারা;

৫. প্রমিত ভাষায় বিভিন্ন ধরনের বিবরণ লিখতে পারা, অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা এবং কোনো কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারা;

৬. কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক—সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের গঠন-বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা এবং এগুলো রচনার মধ্য দিয়ে নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারা; এবং

৭. কোনো কিছু বোঝার জন্য যথাযথ প্রশ্ন করতে পারা, অন্যের মত বিবেচনায় নিতে পারা এবং যুক্তি দিয়ে কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা করতে পারা।

পূর্ববর্তী শ্রেণির বইয়ের মতো সপ্তম শ্রেণির বইটিও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। আমরা আশা করি, এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ভাষাদক্ষতা ও সাহিত্য জ্ঞান বাড়াতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	**প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি**	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রমিত ভাষায় কথা বলি**	
	১ম পরিচ্ছেদ: ধ্বনির উচ্চারণ	১৪
	২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের উচ্চারণ	২০
তৃতীয় অধ্যায়	**অর্থ বুঝে বাক্য লিখি**	
	১ম পরিচ্ছেদ: শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি	২৬
	২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের গঠন	৩১
	৩য় পরিচ্ছেদ: শব্দের অর্থ	৪১
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: যতিচিহ্ন	৫০
	৫ম পরিচ্ছেদ: বাক্য	৫৬
চতুর্থ অধ্যায়	**চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই**	৬০
পঞ্চম অধ্যায়	**বুঝে পড়ি লিখতে শিখি**	
	১ম পরিচ্ছেদ: প্রায়োগিক লেখা	৭২
	২য় পরিচ্ছেদ: বিবরণমূলক লেখা	৭৯
	৩য় পরিচ্ছেদ: তথ্যমূলক লেখা	৮৭
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: বিশ্লেষণমূলক লেখা	৯৫
	৫ম পরিচ্ছেদ: কল্পনানির্ভর লেখা	১০৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সাহিত্য পড়ি লিখতে শিখি**	
	১ম পরিচ্ছেদ: কবিতা	১১৭
	২য় পরিচ্ছেদ: ছড়া	১৩৬
	৩য় পরিচ্ছেদ: গান	১৪৪
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: গল্প	১৪৮
	৫ম পরিচ্ছেদ: প্রবন্ধ	১৬৩
	৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ: নাটক	১৭১
	৭ম পরিচ্ছেদ: সাহিত্যের নানা রূপ	১৮১
সপ্তম অধ্যায়	**অন্যের মত বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করি**	
	১ম পরিচ্ছেদ: প্রশ্ন করতে শেখা	১৮৪
	২য় পরিচ্ছেদ: সমালোচনা করতে শেখা	১৮৬

প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি

পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ

নিচে কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ আছে। এসব পরিস্থিতিতে কীভাবে যোগাযোগ করবে, তা পরিকল্পনা করো এবং ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

পরিস্থিতি ১

আজ তুমি ও তোমার সহপাঠী সবার আগে ক্লাসে চলে এসেছ। ক্লাসরুম একটু আগেই ঝাড়ু দেওয়া হয়েছে এবং মেঝে পানি দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে, যা তুমি খেয়াল করোনি। ভেজা মেঝেতে তোমার জুতার ছাপ পড়ায়, বিদ্যালয়ের পরিছন্নতাকর্মী ওই জায়গাগুলোতে আবার মুছে দিতে থাকলেন। এ অবস্থায় তুমি তাকে কী বলবে এবং কীভাবে বলবে?

পরিস্থিতি ২

বিশেষ প্রয়োজনে মাকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি যেতে হবে, যেখানে আগে কখনো যাওনি। সেই আত্মীয়রা থাকে তোমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে। ওই জায়গায় কীভাবে যাবে, আর ঠিকমতো পৌঁছানোর পর কার কার সাথে যোগাযোগ করবে?

পরিস্থিতি ৩

বিদ্যালয়ে আসার পথে জানতে পারলে তোমাদের স্কুলের একজন শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহের শিকার হতে যাচ্ছে। এ নিয়ে বন্ধুরা মিলে আলোচনা করলে এবং সিদ্ধান্ত হলো যে তোমরা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। এখন বন্ধুরা মিলে কার কার সাথে যোগাযোগ করবে ও কী বলবে?

পরিস্থিতি ৪

বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি হয়েছে । সে ও তার পরিবার এ এলাকায় কিছুদিন আগে এসেছে। তোমার বিদ্যালয় এবং এলাকা সম্পর্কে তাকে কীভাবে পরিচিত করবে?

পরিস্থিতি ৫

একটি বিষয় নিয়ে তোমার দুই বন্ধুর মধ্যে মতের পার্থক্য হয়েছে এবং তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এ অবস্থা চলায় তুমি এগিয়ে গেলে এবং তাদেরকে শান্ত করতে চাইলে। তোমার ভূমিকা ও কথা কী হবে?

পরিস্থিতি ৬

তোমার কাছাকাছি এলাকায় আগুন লেগেছে। এ রকম জরুরি অবস্থায় কার কার সাথে কিংবা কোন সেবাসংস্থার সাথে যোগাযোগ করবে এবং কীভাবে যোগাযোগ করবে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

যে কোনো ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত বলে তোমার মনে হয়, সেগুলো নিচে লেখো।

ক) ....

....

খ) ....

....

গ) ....

....

ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ

মানুষের সাথে কথা বলার সময়ে বয়স ও মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করতে হয়। তুমি, আপনি, তুই, সে, তিনি, ও—এগুলো সর্বনাম শব্দ। সর্বনাম মূলত তিন ধরনের:

১. সাধারণ সর্বনাম

২. মানী সর্বনাম

৩. ঘনিষ্ঠ সর্বনাম

তুমি করে বলা যায় ভাই-বোনের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে, বাবা-মার সঙ্গে, বন্ধুর সঙ্গে। এগুলো সাধারণ সর্বনাম। আপনি করে বলতে হয় শিক্ষকের সঙ্গে, বয়সে বড়ো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, অপরিচিত লোকের সঙ্গে। এগুলো মানী সর্বনাম। তুই করে বলা হয় কারো সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতা থাকলে। আবার কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলার সময়েও তুই ব্যবহার করা হয়। এগুলো ঘনিষ্ঠ সর্বনাম। মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনামের যেমন পরিবর্তন হয়, ক্রিয়ারও তেমন পরিবর্তন হয়। নিচে সর্বনাম অনুযায়ী 'করা' ক্রিয়ার কয়েকটি রূপ দেখানো হলো। এখানে সর্বনামের একবচন ও বহুবচন দুটি রূপই দেওয়া আছে।

সর্বনাম অনুযায়ী ক্রিয়াপদের রূপ

সাধারণ সর্বনাম	মানী সর্বনাম	ঘনিষ্ঠ সর্বনাম
তুমি/তোমরা করো	আপনি/আপনারা করুন	তুই/তোরা করিস
তুমি/তোমরা করছ	আপনি/আপনারা করছেন	তুই/তোরা করছিস
তুমি/তোমরা করেছ	আপনি/আপনারা করেছেন	তুই/তোরা করেছিস
তুমি/তোমরা করতে	আপনি/আপনারা করতেন	তুই/তোরা করতিস
তুমি/তোমরা করেছিলে	আপনি /আপনারা করেছিলেন	তুই/তোরা করেছিলি
তুমি/তোমরা করবে	আপনি/আপনারা করবেন	তুই/তোরা করবি
তুমি/তোমরা কোরো		
সে/তারা করে	তিনি/তাঁরা করেন	ও/ওরা করে
সে/তারা করছে	তিনি/তাঁরা করছেন	ও/ওরা করছে
সে/তারা করেছে	তিনি/তাঁরা করেছেন	ও/ওরা করেছে
সে/তারা করত	তিনি/তাঁরা করতেন	ও/ওরা করত
সে/তারা করেছিল	তিনি/তাঁরা করেছিলেন	ও/ওরা করেছিল
সে/তারা করবে	তিনি/তাঁরা করবেন	ও/ওরা করবে

মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়ার প্রয়োগ

সর্বনাম ও ক্রিয়াশব্দগুলো মর্যাদা অনুযায়ী ঠিক করে নিচের খালি জায়গায় লেখো।

আমার নানা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে নিয়ে আমার বড়ো মামা জেলা সদরের হাসপাতালে গেল। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিল, কয়েকদিন রোগীকে হাসপাতালে থাকতে হবে। ওই সময় নানা তিন-চার দিন হাসপাতালে ছিল। মা হাসপাতালে থেকে নানার সেবা করত।

একদিন বিকালে আমি বড়ো মামার সাথে হাসপাতালে গিয়েছিলাম নানাকে দেখতে। এত বড়ো হাসপাতাল আমি আগে দেখিনি। জরুরি বিভাগের সামনে একটু পরপরই রোগী আসছে। আর সেখানকার ডাক্তার-নার্স সেসব রোগী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। বেশি লোকের ভিড় দেখে দারোয়ান বারবার বলছে, 'তোমরা এখানে ভিড় করবেন না।'

নানা আমাকে দেখে খুব খুশি হলো। তবু তিনি বলল, 'তুই আবার আসতে গেলে কেন?' নানা আমাকে আদর করে তুই করে বলে। আমি ছোটোবেলায় নানাকে তুমি করে বলতাম। এখন তাকে আপনি করে বলি। আমি নানার কথার উত্তরে বললাম, 'নানাভাই, আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।'

খানিক বাদে একজন নার্স এসে নানাকে ওষুধ খাইয়ে গেল। সে বললেন কাল নানাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যার আগে আগে বড়ো মামা যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বলল, 'চলো, এবার যাই; কাল সকালে আবার আসিস।' আমি বললাম 'চলো, মামা।'

ভাষিক যোগাযোগ অভাষিক যোগাযোগ

আমরা যখন অন্যের সাথে কথা বলি, সেটা একধরনের যোগাযোগ। চিঠি বা পত্র লিখেও আমরা যোগাযোগ করি। আবার, ইশারা বা আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও আমরা যোগাযোগ করি। বিভিন্ন ছবি বা সংকেতের মাধ্যমেও আমাদের যোগাযোগ বা ভাব-বিনিময় হয়।

দৈনন্দিন জীবনে তুমি চর্চা করো এমন কয়েকটি ভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ দাও।

....

....

....

দৈনন্দিন জীবনে তুমি চর্চা করো এমন কয়েকটি অভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ দাও।

....

....

....

মানুষ নানা প্রয়োজনে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ মূলত দুইভাবে হয়:

১. ভাষিক যোগাযোগ

২. অভাষিক যোগাযোগ

ভাষিক যোগাযোগ: ভাষিক যোগাযোগের প্রধান রূপ চারটি–শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এর মধ্যে বলা ও শোনার কাজে মুখ ও কানের ভূমিকা প্রধান। যন্ত্র থেকে তৈরি শব্দও আমরা কান দিয়ে শুনে থাকি। অন্যদিকে লেখা ও পড়ার কাজে হাত ও চোখ প্রধান ভূমিকা রাখে। যন্ত্রে লেখা শব্দও আমরা চোখ দিয়ে পড়তে পারি। কথা বলা, বই পড়া, ফোনে আলাপ করা ও বার্তা পাঠানো, রেডিও-টেলিভিশন শোনা ও দেখা, কাগজে লেখা বা কম্পিউটারে টাইপ করা ইত্যাদি ভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ। এছাড়া শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য রয়েছে ইশারা ভাষা এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য রয়েছে ব্রেইল ভাষা।

অভাষিক যোগাযোগ: যোগাযোগের ক্ষেত্রে কথা বলা ও লেখার পাশাপাশি কিছু অভাষিক কৌশলও কাজে লাগানো হয়। তখন মুখভঙ্গি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, হাত ও চোখের ইশারা, হাতের স্পর্শ, ছবি ও সংকেত ইত্যাদির ব্যবহার হয়।

প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ

শ্রেণিশিক্ষক সোমা আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, 'তোমরা কি গতকাল নোটিশ বোর্ড দেখেছ?'

সোহেল দাঁড়িয়ে বলল, 'আপা, আমি গতকাল স্কুলে আসিনি।'

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠল। কী লেখা থাকতে পারে নোটিশ বোর্ডে? সোহেলের মতো দু-একজন গতকাল স্কুলে আসেনি। তাদের জানার কথা নয়। তবে, যারা স্কুলে ছিল, তাদের সবাই ঠিকমতো নোটিশবোর্ড খেয়াল করেনি। ফলে সেখানে কী লেখা আছে, সবার জানা নেই।

সোমা আপা বললেন, 'তোমরা যারা দেখোনি, তারা দেখে নিও। তবে আমি জানতে চাচ্ছি, এমন কেউ কি আছ যে নোটিশ বোর্ড দেখেছ এবং সেখানে কী লেখা আছে তা বলতে পারবে।'

মিলি বলল, 'আপা, আমি দেখেছি। আমি বলতে পারব সেখানে কী লেখা আছে।'

সোমা আপা মিলিকে বলার অনুমতি দিলেন।

মিলি বলল, 'নোটিশবোর্ডে লেখা আছে সামনের সপ্তাহে স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আর একজন শিক্ষার্থী দুটি খেলায় নাম দিতে পারবে।'

সোমা আপা যোগ করলেন, 'তোমরা দলগতভাবেও একটি খেলায় নাম দিতে পারবে। দলগতভাবে খেলার জন্য আছে ক্রিকেট এবং হ্যান্ডবল। কে কোন খেলা খেলবে, তা ঠিক করে আমার কাছে নাম জমা দাও।'

তারপর সবাই মিলে আলাপ করতে লাগল কে কোন খেলায় নাম লেখাবে। সোহেল ক্রিকেট ভালো খেলে, তাই তাকে দলনেতা করে দলগঠনের কথা হতে লাগল। পলাশ ওই কথার মধ্যেই সোহেলকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই গতকাল স্কুলে আসিসনি কেন?' সোহেল জবাব না দিয়ে ক্রিকেট দলে কে কে থাকবে, তার তালিকা তৈরি করতে লাগল।

পলাশ বলল, 'সোহেল, তুই কি অসুস্থ ছিলি?'

সোহেল সংক্ষেপে বলল, 'না।'

পলাশ এবার বলল, 'তুই অসুস্থ ছিলি না। তবে কাল কেন আসিসনি? তোর বড়ো মামার তো বিদেশ থেকে আসার কথা ছিল। তিনি কি গতকাল এসেছেন?'

সোহেল একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওগুলো নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আগে ক্রিকেটের দলগঠন শেষ করি।'

পলাশের এবার সত্যি সত্যি মনে হলো, সোহেলের বড়ো মামা বুঝি বিদেশ থেকে এসেছেন। তাই সে বলল, 'বিদেশ থেকে কী এনেছেন রে!'

সোহেল এবার উঁচু গলায় বলল, 'আমি এ নিয়ে কথা বলব না।'

পড়ে কী বুঝলাম

সোমা আপা ক্লাসে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন?

....

....

সোহেল কেন পলাশের কথায় বিরক্ত হয়েছিল?

....

....

....

পলাশ যা জানতে চাচ্ছিল, তা আর কোন উপায়ে সে জানতে পারত?

....

....

....

সোহেল কীভাবে পলাশকে প্রসঙ্গের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে পারত?

....

....

....

পলাশ কীভাবে সোহেলের সাথে কথা বললে তা প্রাসঙ্গিক হতো?

....

....

....

প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক বিবেচনায় রাখতে হয় বলে তুমি মনে করো?

....

....

....

প্রাসঙ্গিক কথা অপ্রাসঙ্গিক কথা

কোনো কিছু নিয়ে কথা বলার সময়ে বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়। বিষয়ের মধ্যে থেকে কথা বলাকে প্রাসঙ্গিক কথা বলে। আর বিষয়ের বাইরের কথাকে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে। প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করতে পারা একটি দরকারি যোগ্যতা। দুজন বা কয়েকজন মিলে আলাপের সময়ে বক্তা কিংবা শ্রোতাকে প্রসঙ্গের মধ্যে ধরে রাখতে হয়।

প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজি

একজন শিক্ষার্থী লালবাগের কেল্লা ঘুরতে গিয়েছিল। সে লালবাগ কেল্লা ঘুরে এসে নিচের মতো করে লিখল:

অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল পুরাতন কোনো ঐতিহাসিক জায়গা ঘুরতে যাব। বাবার মুখে অনেকবার লালবাগ কেল্লার কথা শুনেছি। ঠিক করা হলো সবাই মিলে সেখানে যাব। আমাদের যাওয়ার কথা শুনে আমার মামাতো বোনও যেতে চাইল। ওর নাম শেফালি। শেফালিকে নিয়ে অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। একবার যেমন, আমার মামা ওকে বলেছিলেন, 'শেফালি, তুমি কি আমার জন্য এক কাপ চা বানিয়ে আনতে পারবে?' শেফালি কী বুঝল কে জানে! একটা ডিম ফাটিয়ে ভাজি করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। তা দেখে আমার মামি হাসতে লাগলেন। শেফালি অনেক লজ্জা পেয়েছিল সেদিন।

শেফালি লালবাগ কেল্লা দেখতে চায় শুনে বাবা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে।' আমরা টিকিট কেটে কেল্লার ভিতরে ঢুকলাম। ওখানে যেতে যেতেই বাবা বলেছিলেন, লালবাগের কেল্লা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি মোগল আমলে তৈরি করা একটি দুর্গ। ১৬৭৮ সালে মোগল সুবেদার আজম শাহ দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। আজম শাহ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র। বাবা আরও বলেছিলেন, দুর্গের কাজ শেষ হওয়ার আগেই আজম শাহকে দিল্লি চলে যেতে হয়। এরপর ১৬৮০ সালে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ দুর্গ তৈরির কাজ আবার শুরু করেন। কিন্তু ১৬৮৪ সালে শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরীবিবি হঠাৎ মারা যান। শায়েস্তা খাঁ তখন দুর্গের কাজ থামিয়ে দেন।

আগের পৃষ্ঠার রচনাটির মধ্যে কোন কোন কথা লালবাগ কেল্লা ভ্রমণের সাথে প্রাসঙ্গিক, আর কোন কোন কথা অপ্রাসঙ্গিক, তা নিচে লেখো।

প্রাসঙ্গিক কথা

....

....

....

....

....

....

....

....

....

অপ্রাসঙ্গিক কথা

....

....

....

....

....

....

....

....

....

উপস্থিত বক্তৃতা

তোমরা একটি করে বিষয় লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দাও। বিষয় হতে পারে যে কোনো কিছু, যেমন–আমার প্রিয় খেলা, রেলগাড়ি, বর্ষাকাল ইত্যাদি। শিক্ষক সেগুলো থেকে লটারির মাধ্যমে একেক জনকে একেকটি বিষয় নিয়ে বলতে দেবেন। কথা বলার সময় অন্যরা খেয়াল করবে কোন কথাগুলো প্রাসঙ্গিক, আর কোন কথাগুলো প্রাসঙ্গিক নয়।

উপস্থিত বক্তৃতার সময়ে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে পারো:

ক. প্রথমে বিষয় অনুযায়ী বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে কথা শুরু করতে হয়;
খ. উপস্থিত বক্তৃতায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করা যায় না;
গ. বিষয়টির ধারণা পরিষ্কার করার জন্য উদাহরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদির প্রয়োজন হতে পারে;
ঘ. বিষয়ের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হয়;
ঙ. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কথা শেষ করতে হয়;
চ. বক্তৃতার ভাষা প্রমিত হতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রমিত ভাষায় কথা বলি

১ম পরিচ্ছেদ

ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক রকমের নয়। অঞ্চলভেদে অনেক শব্দের উচ্চারণ আলাদা হয়, কখনো কখনো একই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন শব্দও ব্যবহার করা হয়। ভাষাগত এই তফাতকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার কারণে এক অঞ্চলের মানুষের কথা আর এক অঞ্চলের মানুষের বুঝতে সমস্যা হয়। অন্যদিকে প্রমিত ভাষায় কথা বললে সব অঞ্চলের মানুষ সহজে বুঝতে পারে। প্রমিত ভাষাকে মনে করা হয় ভাষার মান রূপ বা আদর্শ রূপ।

প্রমিত ভাষার দুটি রূপ আছে: কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত। কথ্য প্রমিত ব্যবহার হয় আনুষ্ঠানিক কথা বলার সময়ে, অন্যদিকে লেখ্য প্রমিত ব্যবহার হয় লিখিত যোগাযোগের কাজে।

প্রমিত ভাষার প্রয়োগ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অফিস-আদালতে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, সংবাদ পাঠ, হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার, যে কোনো ধরনের ঘোষণা, খেলার মাঠের ধারাবিবরণী, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, কোনো বিষয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলা হয়ে থাকে।

উপরের যে কোনো একটি আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতি এককভাবে বা দলে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। উপস্থাপন করা হয়ে গেলে কোন কোন শব্দ প্রমিত হয়নি, সে ব্যাপারে সহপাঠীদের মতামত নাও এবং নিচের ছক পূরণ করো।

যে শব্দটি প্রমিত হয়নি	শব্দটির প্রমিত রূপ
পাঠকাটি	পাটকাঠি
গইয়া	পেয়ারা

শব্দ খুঁজি

অনেক শব্দ তোমার চারপাশের মানুষ ভিন্নভাবে উচ্চারণ করে, কিংবা প্রমিত শব্দের বদলে আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। তোমার উচ্চারণেও হয়তো এ রকম ব্যাপার ঘটে। প্রথম কলামে এ ধরনের শব্দ এবং দ্বিতীয় কলামে এর প্রমিত রূপ লেখো। শব্দটির উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটেছে, না কি শব্দের রূপটিই পরিবর্তিত হয়েছে, তা তৃতীয় কলামে নির্দেশ করো।

আঞ্চলিক উচ্চারণ/শব্দ	প্রমিত শব্দ	উচ্চারণগত/শব্দগত পরিবর্তন
খাইছি	খেয়েছি	উচ্চারণগত পরিবর্তন
চঙ্গা	মই	শব্দগত পরিবর্তন

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

আমাদের গলার ভিতরে শ্বাসনালির উপরের অংশে যে পর্দা থাকে, তাকে ধ্বনিদ্বার বা স্বরতন্ত্রী বলে। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার সময়ে এই ধ্বনিদ্বার কাঁপে। কিছু ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার কম কাঁপে, সেগুলোকে বলে অঘোষ ধ্বনি। যেমন: ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ। আবার কিছু ধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিদ্বার বেশি কাঁপে, সেগুলোকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন: গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ ধ ন ব ভ ম। ধ্বনিদ্বারের বাইরে থেকে গলায় আলতোভাবে দুটি আঙুল রেখে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করলে ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনির পার্থক্য বুঝতে পারবে।

উচ্চারণ অনুশীলন করার জন্য নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। ধ্বনির উচ্চারণ যথাযথ রেখে এগুলো জোরে জোরে পড়ো:

কই	খই	গই	ঘই
চই	ছই	জই	ঝই
চাল	ছাল	জাল	ঝাল
টাল	ঠাল	ডাল	ঢাল
টিন	ঠিন	ডিন	ঢিন
তিন	থিন	দিন	ধিন
তুপ	থুপ	দুপ	ধুপ
পুপ	ফুপ	বুপ	ভুপ
কেক	খেক	গেক	ঘেক
পেক	ফেক	বেক	ভেক
ক্যাট	খ্যাট	গ্যাট	ঘ্যাট
ট্যাট	ঠ্যাট	ড্যাট	ঢ্যাট
চোর	ছোর	জোর	ঝোর
তোর	থোর	দোর	ধোর

উচ্চারণ ঠিক রেখে ছড়া পড়ি

এখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা একটি কবিতা দেওয়া হলো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২২ সালে মারা যান। তাঁকে বলা হয় ‘ছন্দের জাদুকর’। ‘বেণু ও বীণা’, ‘ফুলের ফসল’, ‘কুহু ও কেকা’ ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই। নিচের কবিতাটি কবির ‘কুহু ও কেকা’ নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো।

ছিন্ন-মুকুল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সবচেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয়নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,–
খুশি ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে,
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি,
ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি!

সবচেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে;
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যে-জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

শব্দের অর্থ

গেলাস: গ্লাস।

ঘেঁষাঘেঁষির ঘর: একসাথে কয়েক ভাইবোন বড়ো হয় যে বাড়িতে।

ঘোচা: শেষ হওয়া।

তরাস: ত্রাস, ভয়।

পিঁড়ি: বসার ছোটো আসন।

পুঁতির মালা: পুঁতি দিয়ে তৈরি করা মালা।

পেতে রাখা: বসার জন্য মেঝেতে রাখা।

ভাতবাড়া: খাওয়ার জন্য ভাত থালায় রাখা।

শয্যা: শোয়ার বিছানা।

উচ্চারণ ঠিক করি

উচ্চারণের সময়ে অঞ্চলভেদে ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হতে পারে, কিংবা অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হতে পারে। আবার, অল্পপ্রাণ ধ্বনি বদলে মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়ে যেতে পারে, কিংবা মহাপ্রাণ ধ্বনি বদলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়ে যেতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা শিখেছ, বাতাস কম-বেশির কারণে ধ্বনি অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ হয়। যেমন: ক গ চ জ ট ড ত দ প ব ধ্বনি অল্পপ্রাণ এবং খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ ধ্বনি মহাপ্রাণ।

নিচের ছকে 'ছিন্ন মুকুল' কবিতা থেকে কিছু শব্দ দেওয়া হয়েছে। যেসব ধ্বনির উচ্চারণে ঘোষ-অঘোষ কিংবা অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণের পার্থক্য ঘটতে পারে, সেগুলো লাল হরফে দেখানো হলো। তোমার উচ্চারণ ঠিক হলে ডান কলামে টিকচিহ্ন (√) দাও।

শব্দ	অঞ্চলভেদে বর্ণটির উচ্চারণ যা হতে পারে	বর্ণটির প্রমিত উচ্চারণ যা হবে	এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে	উচ্চারণ ঠিক হলে টিকচিহ্ন দাও
সবচেয়ে	প	ব	ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি হয়েছে	
পিঁড়ি	ফ	প	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ছোটো	ড	ট		
পেতে	ফ	প		
ভাত	ব	ভ		
বাড়ি	ভ	ব		
ঘুচেছে	ছ	চ		
পুঁতি	ফ	প		
আঁধার	দ	ধ		
ঘর	ঘ	গ		
চাবি	ছ	চ		
ছাদ	ত	দ		

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দের উচ্চারণ

নিচে একটি গল্প দেওয়া হলো। গল্পের নাম ‘কত দিকে কত কারিগর’। এটি সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) লেখা। সৈয়দ শামসুল হক কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার কারণে তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে–‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’, ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ ইত্যাদি। তিনি সিনেমার জন্যও কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান লিখেছেন।

‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্পটি পড়ার সময়ে প্রমিত উচ্চারণের দিকে খেয়াল রেখো।

কত দিকে কত কারিগর

সৈয়দ শামসুল হক

নদী পার হয়ে, ওপারে কুমোরদের একটা গ্রামের ভেতরে সারাদিন দেখছি ওদের মাটির কাজ। হাঁড়ি পাতিল সরা সানকি তৈরি করছে ওরা। বেশি কৌতূহল নিয়ে দেখেছি পাটার কাজ। মাটির পাটায় ফুলের নকশা, রবীন্দ্রনাথ, বেণীবন্ধনরত যুবতীর চিত্র, জয়নুলের আঁকা গরুর চাকা ঠেলে তোলার প্রতিলিপি, উড়ন্ত পরি, ময়ূরপঙ্খি নৌকার চিত্র, চোখ বুজে নজরুল যে বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই ফটোগ্রাফের নকল। বাঁশবনে আচ্ছন্ন শীতল একটি গ্রামে, অবিশ্বাস্য ঝিম ধরা নীরবতার ভেতরে, সবুজ শ্যাওলা ধরা কুমোরদের প্রাঙ্গণে সার দিয়ে সাজানো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জয়নুল।

আজকাল এগুলোর বিক্রি ভালো। সস্তায় ঘরের দেয়াল সাজাবার জন্যে অনেকেই কেনে। একেকটা চিত্রের জন্যে কাঠের ওপর খোদাই করা নকশা আছে। তার ওপর কাদার তাল টিপে টিপে পাটা তৈরি করছে ওরা। কাদার তালে ফুটে উঠছে নকশা। বাঁশের কলম দিয়ে সংশোধন করে পাটাগুলো ভাঁটিতে পোড়াবার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে।

কাজ করছে যারা তাদের ভেতরে কিশোর বেশ কয়েকজন। যুবক দুজন। আর একপাশে উঁচু পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে কাজের তদারক করছেন বৃদ্ধ পালমশাই। মাথায় টাক। কানের দুপাশে সাদা এক খামচা করে চুল। তিনি শ্যেন চোখে কারিগরদের হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

–এইও। করলি কী! আরে দামড়া!

কারিগর ছোকরা এতগুলো। কাকে দামড়া বলে সম্বোধন করলেন, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বুঝেছে ঠিক যাকে বলা হয়েছে সে। দেখলাম, সে ছোকরা চোখ না তুলেই চট করে একটিপ মাটি নিয়ে ময়ূরপঙ্খি নৌকায় বসা মহারাজ ধরনের মূর্তিটির মুকুটে লাগাল।

পালমশাই আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, নজর না রাখলে কাম সারা। দ্যাখলেন না? চান্দ সওদাগরের মুকুটটা যে ছাঁচে ওঠে নাই, ব্যাটার খ্যাল নাই। বলেই 'উঁহু' করেই নিজেই উঠে গেলেন ছোকরার কাছে।

তারপর ছোকরার হাত থেকে বাঁশের চিকন কলমটা খপ করে টেনে নিয়ে মুকুটের ওপর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চিকন নকশা এঁকে দিলেন।

–জ্যাঠা।

পেছন থেকে ডাক শুনে বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকালেন পালমশাই।

ব্যাস আর কোনো কথা নয় কারো তরফে। ঘুরে তাকিয়ে তিনিও বুঝতে পারলেন, যে ছোকরা ডাক দিয়েছিল সেও মাথা নিচু করে বসে রইল সমুখের কাঁচা মাটির পাটার দিকে তাকিয়ে।

আরে, দামড়া! রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে ঢেউ খেলানো কয়বার দেখাইয়া দিতে অয়? আমার দিকে ফিরে বললেন, বোঝলেন, এই দাড়ি তো বাংলার সক্কলে চেনে। চেনে মানে, ছায়া দেখলেও চেনে। খালি ছায়া দিয়াই বুঝান যায় রবীন্দ্রনাথ। তাইলে বোঝেন, সেই কবির দাড়িই যদি ঠিক না অয়, দাড়ি দেইখা যদি লালন ফকির মনে হয়, কি মাওলানা ভাসানী মনে হয়, তাইলে চলব?

আবার দ্রুত হাত চলে পালমশাইয়ের। মহাবিরক্ত হয়ে তিনি কাঁচামাটির পাটায় রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে সূক্ষ্ম আঁচড় কেটে চলেন। আঁচড় কাটতে কাটতে আমাকে বলেন, বোঝলেন, কাঠের ছাঁচে সকল টানটোন ছাপছোপ ঠিক ওঠে না। হাতে ঠিক করতে অয়। নইলে মাল নষ্ট। পয়সা নষ্ট। তার উপর ধরেন, ভাঁটি থিকা বাইর করলেও কিছু বাদ-বাতিল হয়া যায়।

জয়নুলের আঁকা গরুর গাড়ির চাকা ঠেলে তোলার ছবির দিকে দেখিয়ে পালমশাইকে জিগ্যেস করি, এটা কার ছবি?

–ক্যান? মানুষ চাকা ঠেইলা তোলে–সেই ছবি।

–সে কথা নয়। কার আঁকা ছবি?

পালমশাই একটু ইতস্তত করে বললেন, ধরেন, আমাগো আঁকা।

আমি হেসে বললাম, পালমশাই, এটা জয়নুল আবেদীনের আঁকা।

শুনে কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিরাসক্ত গলায় বললেন, হ, হইতে পারে। কেটা জানে! কত দিকে কত কারিগর আছে। জয়নাল না কী কইলেন? নাম মনে থাকে না। তারপর ধরেন গিয়া, আমরা যে আর্টের কাম করি, আমাগো চেনে কয়জন? নাম জানে কয়জন? এই যে আমার বাবায়, তানি ছিলেন এতবড়ো আর্টিস্ট, কে তারে স্মরণ রাখছে কন? তারপর একটু চুপ থেকে বললেন, জয়নাল? হ, হইতে পারে। তয়, এই নকশাটা খুব চলছে।

জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, এটা তো রবীন্দ্রনাথ। ওটা কবি নজরুল–বাঁশি বাজাচ্ছেন।

পালমশাই সন্দিগ্ধ চোখে একবার আমার, একবার পাটা দুটোর দিকে তাকালেন। ভাবলেন, হয়তো চেহারা ঠিক মেলেনি। বললেন, ক্যান, কী হইছে?

–না, ঠিকই আছে। আমি শুধু জানতে চাইছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি করেন না?

–বঙ্গবন্ধু?

–হ্যাঁ।

–ক্যান, দ্যাহেন নাই–ঐ যে উপরে চাইয়া দেহেন–সবার উপরেই তো বঙ্গবন্ধুর দুইডা ছবি। হেরে তো মধ্যে বা নিচে রাহন যায় না।

এতক্ষণ মুঠোতে ধরে রাখা চশমাটা এবার চোখে দিলাম। সত্যি, বঙ্গবন্ধুকে এই কারিগর স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

শব্দের অর্থ

অবিশ্বাস্য: যা বিশ্বাস করা যায় না।
আঁচড়: দাগ টানা।
আর্ট: ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্প।
আর্টিস্ট: শিল্পী।
ইতস্তত: দ্বিধা।
এক খামচা চুল: পাঁচ আঙুলের এক খামচিতে তোলা একমুঠ চুল।
একটিপ: একটুখানি।
কাদার তাল: কাদার পিন্ড।
কারিগর: যাঁরা হাতে জিনিস বানান।
কুমোর: মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো যাঁদের পেশা।
কৌতূহল: অবাক, জিজ্ঞাসা।
খোদাই করা নকশা: কেটে কেটে বানানো নকশা।
চান্দ সওদাগর: বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনির একটি চরিত্র।
ছাঁচ: কোনো কিছু বানানোর কাঠামো।
ছোকরা: ছেলে।
জয়নুল আবেদীন: বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।
জ্যাঠা: চাচা।
ঝাপসা: অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট।
তরফ: পক্ষ।
দামড়া: বলদ গরু।
নিরাসক্ত: আবেগহীন, নির্লিপ্ত।
পাটা: মাটির ফলক।
বাঁশবনে আচ্ছন্ন: বাঁশগাছ দিয়ে ভরা।
বেণীবন্ধনরত: বেণী বাঁধছে এমন।
ভাঁটি: মাটির তৈরি জিনিস পোড়ানোর বড়ো চুলা।
ময়ূরপঙ্খি নৌকা: যে নৌকার সামনের দিকটা ময়ূরের মুখের মতো নকশা করা।
মওলানা ভাসানী: বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ।
লালন ফকির: বাংলা ভাষার একজন বিখ্যাত লোককবি ও গায়ক।
শ্যেন: তীক্ষ্ণ, বুনো।
সন্দিগ্ধ: সন্দেহ ভরা।
সমুখের: সামনের।
সরা: মাটির ঢাকনা।
সানকি: মাটির থালা।
সূক্ষ্ম: মিহি, সরু।

শব্দের উচ্চারণ

প্রমিত ভাষায় শব্দের উচ্চারণ ঠিকমতো করতে হয়। ‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্প থেকে কিছু শব্দ বাম কলামে দেওয়া হলো। শব্দগুলোর উচ্চারণে অনেক সময় ভুল হয়, সেটি মাঝের কলামে দেখানো হয়েছে। আর প্রমিত উচ্চারণ কেমন হবে, তা ডানের কলামে লিখে দেখানো হয়েছে। তোমার উচ্চারণ এখান থেকে ঠিক করে নাও।

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ নয়	প্রমিত উচ্চারণ
আঁচড়	আছোড়্	আঁচোড়্
আর্টিস্ট	আটিস্ট্	আর্টিস্ট্
ইতস্তত	ইতোস্তত্	ইতোস্‌ততো
উঁচু	উচু	উঁচু
এতক্ষণ	এতোক্‌খোন্	অ্যাতোক্‌খোন্
কাঁচা	কান্‌চা	কাঁচা

কাঠ	কাট্	কাঠ্
গ্রাম	গেরাম্	গ্রাম্
ঘুরে	গুরে	ঘুরে
চাকা	ছাকা	চাকা
চিকন	চিকুন্	চিকোন্
চিত্র	চিত্তোরো	চিত্ত্রো
চোখ	চুখ্	চোখ্
জন্যে	জোইন্নে	জোন্নে
জিগ্যেস	জিগেশ্	জিগ্গেশ
ঝাপসা	ঝাফ্শা	ঝাপ্সা
ঠেলা	ট্যালা	ঠ্যালা
তদারক	তধারক্	তদারক্
তরফ	তরোপ্	তরোফ্
দ্রুতগতি	দুর্তোগোতি	দ্রুতোগোতি
নৌকা	নুউকা	নোউকা
পাটা	ফাটা	পাটা
প্রতিলিপি	পোর্তিলিপি	প্রোতিলিপি
প্রাঙ্গণ	পিরাঙ্গোন্	প্রাঙ্গোন্
ফটোগ্রাফ	ফটোগিরাফ্	ফটোগ্রাফ্
বাঁশ	বাশ্	বাঁশ্
বৃদ্ধ	বিরিদ্ধো	বৃদ্ধো
বেণী	ভেনি	বেনি
ভ্রু	ভুরু	ভ্রু
শ্যেন	শেন্নো	শেন্
সন্দিগ্ধ	ছোন্দিগ্ধো	শোন্দিগ্ধো
সম্বোধন	সম্মোধন্	সম্বোধন্
সূক্ষ্ম	শুক্মো	শুক্খোঁ
স্থান	ইস্থান্	স্থান্
স্মরণ	ছরোন্	শঁরোন্
হাঁড়ি	হারি	হাঁড়ি

আঞ্চলিক ভাষা

‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্পে পালমশাইয়ের কথায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। নিচের ছকের বাঁ কলাামে পালমশাইয়ের মুখের বাক্য লেখো, আর ডান কলামে বাক্যগুলোকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর করো। একটি করে দেখানো হয়েছে।

আঞ্চলিক বাক্য	প্রমিত রূপ
ক্যান, কী হইছে?	কেন, কী হয়েছে?

প্রমিত ভাষার চর্চা

আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোতে আমরা প্রমিত ভাষায় কথা বলব। শ্রেণিতে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে প্রমিত ভাষায় কথা বলার অনুশীলন করো।

১. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা
২. একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বর বা অন্য কোনো দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা
৩. খবর পাঠ
৪. নিজের কোনো অভিজ্ঞতার উপস্থাপন
৫. লাইব্রেরিয়ান, ডাক্তার বা অন্য কোনো লোকের সাথে আলাপ।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থ বুঝে বাক্য লিখি

১ম পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি

শব্দের শ্রেণি

বাক্যের শব্দগুলোকে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ–এই আট শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো যায়।

বিশেষ্য: যেসব শব্দ দিয়ে ব্যক্তি, প্রাণী, স্থান, বস্তু, ধারণা ও গুণের নাম বোঝায়, সেগুলোকে বিশেষ্য বলে। যেমন: নজরুল, বাঘ, ঢাকা, ইট, ভোজন, সততা।

সর্বনাম: বিশেষ্যের বদলে বাক্যে যেসব শব্দ বসে, সেগুলোকে সর্বনাম বলে। যেমন: 'মুনিরা দাবা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তার জন্য স্কুলের সবাই গর্বিত।' এখানে দ্বিতীয় বাক্যের 'তার' প্রথম বাক্যের মুনিরাকে বোঝাচ্ছে। তাই 'তার' একটি সর্বনাম।

বিশেষণ: যেসব শব্দ দিয়ে বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন: <u>সুন্দর</u> ফুল, <u>বাজে</u> কথা, <u>পঞ্চাশ</u> টাকা, <u>হাজার</u> সমস্যা, <u>তাজা</u> মাছ।

ক্রিয়া: বাক্যের উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয়, তা নির্দেশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে ক্রিয়া বলে। যেমন: রাজীব <u>খেলছে</u>। বৃষ্টি <u>হয়েছিল</u>।

ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া আবার দুই প্রকার: সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া। যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: সে <u>পড়ছে</u>। আর যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: সে <u>পড়লে</u> ভালো করবে। এখানে 'পড়লে' ক্রিয়াটি দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ না হওয়ায় পরে একটি সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

ক্রিয়াবিশেষণ: যে শব্দ ক্রিয়ার অবস্থা, সময় ইত্যাদি নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন: ছেলেটি <u>দ্রুত</u> দৌড়ায়। মেয়েটি <u>সকালে</u> গান করে।

অনুসর্গ: যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সাথে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে। যেমন: সে কাজ <u>ছাড়া</u> কিছুই বোঝে না। কোন <u>পর্যন্ত</u> পড়েছ?

যোজক: শব্দ বা বাক্যের অংশকে যুক্ত করে যেসব শব্দ, সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন: লাল <u>বা</u> নীল কলমটি আনো। জলদি দোকানে যাও <u>এবং</u> পাউরুটি কিনে আনো।

আবেগ: মনের নানা ভাব বা আবগেকে প্রকাশ করা হয় যেসব শব্দ দিয়ে সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলা হয়। যেমন: <u>বাহ্</u>! চমৎকার লিখেছ। <u>উফ</u>, আর পারি না!

শ্রেণি অনুযায়ী শব্দ আলাদা করি

নিচের নমুনা থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ–এই আট শ্রেণির শব্দ চিহ্নিত করো।

বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার। পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য এখানে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র-সৈকত। প্রতিদিন অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটক এই সৈকতে বেড়াতে আসেন। আর এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'বাহ! কী সুন্দর!'

কক্সবাজার সমুদ্র-সৈকতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর ঢেউ। সবসময় বড়ো বড়ো ঢেউ তৈরি হয় সাগরে। আর সেই ঢেউ তীরে এসে জোরে জোরে আছড়ে পড়ে। অনেক মানুষ গা ভেজাতে সৈকতে নামে। তাদের কেউ কেউ ঢেউ দেখে আনন্দে লাফ দেয়। অনেকেই ভেজা বালি দিয়ে ঘর বানায়। ঢেউ এসে সেই ঘর ভেঙে দেয়। তবু তারা হাসিমুখে আবার ঘর বানাতে থাকে।

কক্সবাজার নামটি এসেছে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সের নাম থেকে। হিরাম কক্স ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন অফিসার। এর আগে কক্সবাজারের নাম ছিল পালংকি। হিরাম কক্স আঠারো শতকের শেষ দিকে পালংকির পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় কক্স সাহেবের বাজার।

পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এখানে কয়েকটি মোটেল নির্মাণ করেছে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে অনেক হোটেল তৈরি হয়েছে। সৈকতের কাছে ছোটো-বড়ো অনেক হোটেল আছে। পর্যটকদের জন্য এখানে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের দোকান। দোকানগুলোতে বাহারি জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে হিমছড়ি পর্যটন কেন্দ্র। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হিমছড়ি সমুদ্র সৈকতেও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বেড়াতে যায়। কক্সবাজার থেকে হিমছড়ি যাওয়ার পথটি সুন্দর ও রোমাঞ্চকর। কক্সবাজার ও আশেপাশের পর্যটন স্থানগুলোতে ঘোরার সময়ে কেবলই মনে হয়, আহা! কত সুন্দর আর বৈচিত্র্যময় আমাদের বাংলাদেশ।

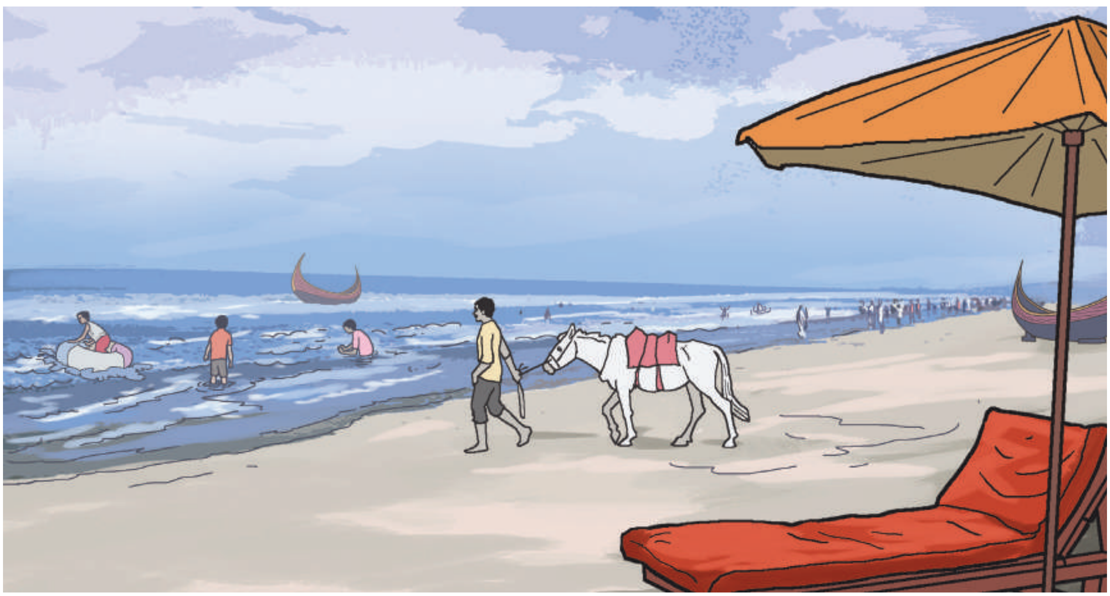

উপরের নমুনা থেকে চিহ্নিত করা বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ—এই আট শ্রেণির শব্দ নিচের ছকে লেখো।

বিশেষ্য	
সর্বনাম	
বিশেষণ	
ক্রিয়া	
ক্রিয়াবিশেষণ	
অনুসর্গ	
যোজক	
আবেগ	

বাক্যের শ্রেণি

ভাবপ্রকাশের ধরন অনুযায়ী বাক্যকে বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক–এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।

বিবৃতিবাচক বাক্য: সাধারণভাবে কোনো বিবরণ প্রকাশ পায় যেসব বাক্যে, সেগুলোকে বিবৃতিবাচক বাক্য বলে। যেমন: একটি পাখি আমাদের কাঁঠাল গাছে বাসা বেঁধেছে।

প্রশ্নবাচক বাক্য: বক্তা কারও কাছ থেকে কিছু জানার জন্য যে ধরনের বাক্য বলে, সেগুলো প্রশ্নবাচক বাক্য। যেমন: কোন পাখি তোমাদের কাঁঠাল গাছে বাসা বেঁধেছে?

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য: আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, প্রার্থনা ইত্যাদি বোঝাতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য হয়। যেমন: কাঁঠাল গাছে একটি হাঁড়ি বেঁধে দাও।

আবেগবাচক বাক্য: কোনো কিছু দেখে বা শুনে অবাক হয়ে যে ধরনের বাক্য তৈরি হয়, তাকে আবেগবাচক বাক্য বলে। যেমন: কী সুন্দর দেখতে সেই পাখিটা!

শ্রেণি অনুযায়ী বাক্য আলাদা করি

নিচের নমুনা থেকে বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক–এই চার রকমের বাক্য চিহ্নিত করো।

বিকাল সাড়ে চারটায় সবার মাঠে আসার কথা। আজ কোনো খেলা হবে না, জরুরি সভা হবে। ইমনদের পুরাতন ভিটায় একটা পোড়োবাড়ি আছে। সেখানে কয়েকদিন ধরে কিছু অপরিচিত লোকের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। কামাল বলছিল, ‘ওখানে গুপ্তধন থাকতে পারে।’ নিলয় খানিক কৌতূহলী হয়ে ইমনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘কী রে ইমন, ওই বাড়িতে গুপ্তধন আছে নাকি?’ ইমন অবাক হয়ে বলেছিল, ‘তাই নাকি! আমি তো জানি না।’ আসলেই কোনো গুপ্তধন আছে কি না, তা যাচাই করার জন্য অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিল কামাল। বলেছিল, ‘চল, আমরাই খোঁজ করে দেখি। গুপ্তধন থাকলে ঠিক খুঁজে পাব।’ ইমনদের পোড়োবাড়িতে কবে এবং কীভাবে অভিযান চালানো হবে, তা নিয়ে আলোচনার জন্যই আজকের সভা।

আমার অবশ্য খানিক ভয় ভয় করছে। কারণ, অপরিচিত লোকগুলো যদি ঠিক গুপ্তধন খুঁজতে আসে! আর যদি আমাদের সাথে ওদের দেখা হয়ে যায়! তবে ঠিক তারা প্রশ্ন করবে, ‘এখানে কী করছো তোমরা?’ তখন আমরা কী উত্তর দেবো? উত্তর ওদের পছন্দ না হলে বলতে পারে, ‘এখানে আর আসবে না। যাও, চলে যাও।’ তাছাড়া লোকগুলো হয়তো গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি, অন্য কাজে এসেছে। তবু সেখানে যেতে আমার ভয় করবে। যে পুরাতন বাড়ি! বাড়ির চারপাশে কত বড়ো বড়ো গাছ! দিনের বেলাতেও বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার হয়ে থাকে। সেখানে এমনিতেই সহজে কেউ ঢুকতে চায় না।

আগের পৃষ্ঠার নমুনা থেকে বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক–এই চার রকমের বাক্য নিচের ছকে লেখো।

বিবৃতিবাচক বাক্য	
প্রশ্নবাচক বাক্য	
অনুজ্ঞাবাচক বাক্য	
আবেগবাচক বাক্য	

২য় পরিচ্ছেদ

শব্দের গঠন

নমুনা ১

রেলগাড়ি চলে রেললাইনের উপর দিয়ে। দেশে-বিদেশে যত রকম যানবাহন আছে, তার মধ্যে রেলগাড়ি সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয়। ছেলেবুড়ো সবাই এর কু-ঝিকঝিক শব্দ শুনে মুগ্ধ হয়। নদী-নালা, পাহাড়-পর্বতের পাশ দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে রেলগাড়ি ছুটে চলে। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে মাঝে মাঝে দেখা যেতে পারে কুঁড়েঘর, ধানখেত, নীলাকাশ।

বাংলাদেশের রেলগাড়িতে অনেক সময়ে হকার দেখা যায়। তাঁরা ডিমসিদ্ধ, ঝালমুড়ি, চিড়াভাজা-সহ আরও কত কিছু যে বিক্রি করেন! অনেকে পত্র-পত্রিকা বিক্রির জন্যও রেলে ওঠেন। একবার একতারা হাতে একজনকে রেলগাড়িতে উঠতে দেখেছিলাম। তিনি পল্লিগীতি শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর গান শুনে সবার সাথে আমিও হাততালি দিয়েছিলাম।

রেল-ভ্রমণের আনন্দ অনেক। রেলগাড়িতে না উঠলে তা ঠিক বোঝা যাবে না।

কোনো কোনো শব্দ ভাঙলে দুটি অংশ পাওয়া যায়। দুটি অংশই আলাদাভাবে অর্থযুক্ত। তার মানে, দুটি অর্থযুক্ত শব্দ জোড়া দিয়ে একটি নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে। যেমন: বটতলা। এখানে 'বট' আর 'তলা' দুটি অংশই অর্থযুক্ত। উপরের লেখাটি থেকে এ রকম শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছকে লেখো।

____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

সমাস

যেসব শব্দের দুটি অংশই অর্থযুক্ত সেসব শব্দকে বলা হয় সমাস-সাধিত শব্দ। সমাস শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা:

ভাই + বোন = ভাই-বোন
আসা + যাওয়া = আসা-যাওয়া
ভালো + মন্দ = ভালোমন্দ
আলু + সিদ্ধ = আলুসিদ্ধ
টাক + মাথা = টাকমাথা
ত্রি + ফল = ত্রিফলা
চৌ + রাস্তা = চৌরাস্তা
হাত + ঘড়ি = হাতঘড়ি
কাজল + কালো = কাজলকালো
ছেলে + ভুলানো = ছেলেভুলানো

মামা + বাড়ি = মামাবাড়ি
মধু + মাখা = মধুমাখা
রান্না + ঘর = রান্নাঘর
চা + বাগান = চা-বাগান
গরুর + গাড়ি = গরুরগাড়ি
তেলে + ভাজা = তেলেভাজা
লাল + পাড় = লালপেড়ে
গোঁফ + খেজুর = গোঁফখেজুরে
হাত + খড়ি = হাতখড়ি
বউ + ভাত = বউভাত

সমাসবদ্ধ হওয়ার সময়ে কখনো কখনো শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন, উপরের উদাহরণে ত্রি+ফল মিলে 'ত্রিফল' না হয়ে 'ত্রিফলা' হয়েছে। তেমনি লালপেড়ে, গোঁফখেজুরে, হাতেখড়ি এসব শব্দেও পরিবর্তন ঘটেছে।

সমাস-সাধিত শব্দ বানাই

নিচে বাম কলামে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, ডান কলামেও কিছু শব্দ দেওয়া আছে। দুটি কলামের শব্দ মিলিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো। যেমন: বাম কলাম থেকে 'ফুল' আর ডান কলাম থেকে 'বাগান' নিয়ে 'ফুলবাগান' শব্দটি তৈরি করতে পারো।

বাম কলাম	ডান কলাম
ফুল	পুস্তক
ফল	গাড়ি
গোলাপ	বিজ্ঞান
জীব	ঘর
প্রাণী	জগৎ
বই	গাছ
পাঠ্য	ভর্তা
ঠেলা	বাগান
সবজি	খাতা
আলু	জল

অনুচ্ছেদ লিখে সমাস-সাধিত শব্দ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে সমাস প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

নমুনা ২

উপহার পেতে প্রত্যেকের ভালো লাগে। তবে প্রতিদিন তা পাওয়া যায় না। বিশেষ বিশেষ দিনে আমরা উপহার পাই। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিখাদ আনন্দ আছে। অচেনা অজানা লোকের উপহার সাধারণত আমরা গ্রহণ করি না। জয়-পরাজয়কে সামনে রেখে যে উপহার দেওয়া হয়, তাকে বলে পুরস্কার। পুরস্কার পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় বিশেষ অবস্থান পেতে হয়। বিশেষ কোনো সুকীর্তি বা অবদানের জন্যও মানুষকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বা উপহার পাওয়ার ব্যাপারটি অবশ্যই সম্মানের এবং উপভোগ করার মতো। কোনো কোনো উপহার ও পুরস্কার মানুষ আজীবন মনে রাখে।

কোনো কোনো শব্দের প্রথম অংশের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ থাকে। তার মানে, অর্থযুক্ত শব্দের আগে অর্থহীন অংশ জোড়া দিয়েও নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে। যেমন: অভাব। এখানে, প্রথম অংশ 'অ' অর্থহীন; আর দ্বিতীয় অংশ 'ভাব' অর্থযুক্ত। উপরের লেখাটি থেকে এ রকম শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের খালি জায়গায় লেখো।

______________	______________	______________
______________	______________	______________
______________	______________	______________
______________	______________	______________
______________	______________	______________

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

উপসর্গ

যেসব শব্দের প্রথম অংশ সাধারণত কোনো অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে, সেসব শব্দকে বলা হয় উপসর্গ-সাধিত শব্দ। কোনো শব্দের আগে উপসর্গ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন, বেদখল শব্দের 'বে' একটি উপসর্গ।

উপসর্গ-সাধিত কয়েকটি শব্দের নমুনা:

অ + গভীর = অগভীর	না + বালক = নাবালক
অতি + মারি = অতিমারি	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
অধি + বাসী = অধিবাসী	নিম + রাজি = নিমরাজি
অনা + বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি	পরা + জয় = পরাজয়
অনু + রূপ = অনুরূপ	পরি + ত্যাগ = পরিত্যাগ
অপ + কর্ম = অপকর্ম	পাতি + হাঁস = পাতিহাঁস
অব + রোধ = অবরোধ	প্র + গতি = প্রগতি
অভি + জাত = অভিজাত	প্রতি + ধ্বনি = প্রতিধ্বনি
আ + জীবন = আজীবন	বদ + মেজাজ = বদমেজাজ
উৎ + ক্ষেপণ = উৎক্ষেপণ	বি + শেষ = বিশেষ
উপ + গ্রহ = উপগ্রহ	বে + দখল = বেদখল
কদ + বেল = কদবেল	ভর + পেট = ভরপেট
কু + পথ = কুপথ	স + ঠিক = সঠিক
গর + হাজির = গরহাজির	সম + মান = সম্মান
দর + দালান = দরদালান	সু + দিন = সুদিন
দুঃ + সময় = দুঃসময়	হা + ভাত = হাভাত

উপসর্গ দিয়ে শব্দ বানাই

নিচে বাম কলামে কিছু উপসর্গ দেওয়া আছে, আর ডান কলামে কিছু শব্দ দেওয়া আছে। ডান কলামের শব্দের আগে বাম কলামের উপসর্গ মিলিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো। যেমন: বাম কলাম থেকে 'বি' আর ডান কলাম থেকে 'শেষ' নিয়ে 'বিশেষ' শব্দটি তৈরি করতে পারো।

বাম কলাম	ডান কলাম
বি	ফল
স	জয়
কু	যোগ
সু	খেয়াল
বে	কাল
অ	জন্ম
আ	কার
পরা	গ্রহ
প্র	শেষ
উপ	বৃত্তি

অনুচ্ছেদ লিখে উপসর্গ-সাধিত শব্দ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে উপসর্গের মাধ্যমে গঠিত শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

নমুনা ৩

খেলার মাঠে আমরা রোজ খেলতে যাই। সেখানে মাঝে মাঝে এক চানাচুরওয়ালাকে দেখা যায়। তিনি চানাচুর বিক্রি করতে আসেন। লোকটার পরনে থাকে রঙিন জামা, তাতে অনেক রঙের ছোপ। জামাটা আলখেল্লার মতো লম্বা আর ঢোলা। তবে জামাটার হাতা খাটো, তাই তার হাত দেখা যায়। বেঢপ আকারের হলেও সেই জামাটা তার গায়ে দারুণ মানানসই লাগে। স্কুল গেটে দাঁড়ালে নিশ্চয় তার কাছ থেকে ছাত্র আর ছাত্রীরা চানাচুর কিনত। তবে, কখনো তাকে স্কুলের গেটে আমি দাঁড়াতে দেখিনি।

ওই চানাচুরওয়ালাকে নিয়ে একটা মজার ঘটনা বলি। একদিন তাঁর সামনে ছেঁড়া জামা পরা একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। ছেলেটির বয়স সাত-আটের বেশি হবে না। তার হাতে একটা ভাঙা খেলনা। ছেলেটি সেই খেলনাটি দেখিয়ে চানাচুরওয়ালাকে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই। এই খেলনা নিয়ে আমাকে চানাচুর দেবেন?' এই বলে ছেলেটি তার হাতের খেলনাটি চানাচুরওয়ালার দিকে এগিয়ে দিলো। আমি দেখলাম, খেলনাটি হয়তো একসময়ে দামি ছিল, তবে এখন আর সেটা কেউ দাম দিয়ে কিনবে না। চানাচুরওয়ালা ছেলেটির কথা শুনে মধুর হাসি হাসল। চানাচুর বানিয়ে ঠোঙায় করে ছেলেটির হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান!'

আমার কাছে চানাচুরওয়ালাকে দয়ালু মনে হলো। লোকটির সরলতায় আমি মুগ্ধ হলাম।

কোনো কোনো শব্দের প্রথম অংশ অর্থযুক্ত কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন। তার মানে, অর্থযুক্ত শব্দের পরে অর্থহীন অংশ জোড়া দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে। যেমন: দোকানদার। এখানে, প্রথম অংশ 'দোকান' অর্থযুক্ত; আর দ্বিতীয় অংশ 'দার' অর্থহীন। উপরের লেখাটি থেকে এ রকম শব্দ খুঁজে বের করো এবং নিচের ছকে লেখো।

________	________	________
________	________	________
________	________	________
________	________	________
________	________	________

লেখা শেষ হলে তোমার বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। তাদের সাথে উত্তরের পার্থক্য হলে তা নিয়ে আলোচনা করো।

প্রত্যয়

যেসব শব্দের প্রথম অংশ অর্থযুক্ত এবং দ্বিতীয় অংশ অর্থহীন, সেসব শব্দকে বলা হয় প্রত্যয়-সাধিত শব্দ। প্রত্যয় শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। প্রত্যয়ের নিজের কোনো অর্থ নেই। অর্থযুক্ত কোনো শব্দের পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। যেমন, মধু + র = মধুর। এখানে 'র' যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে; তাই 'র' একটি প্রত্যয়। কিন্তু বাড়ি + র = বাড়ির। এখানে 'র' যোগ হয়ে নতুন কোনো শব্দ তৈরি হয়নি; তাই এই 'র' কোনো প্রত্যয় নয়।

প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দের নমুনা:

পড় + অ = পড়ো
পঠ্ + অক = পাঠক
দাপ + অট = দাপট
খেল + অনা = খেলনা
মান + অনীয় = মাননীয়
উড্ + অন্ত = উড়ন্ত
পড্ + আ = পড়া
বাঘ + আ = বাঘা
ঢাকা + আই = ঢাকাই
সিল্ + আই = সেলাই
ঘির্ + আও = ঘেরাও
গাড়ি + আন = গাড়োয়ান
বিবি + আনা = বিবিয়ানা
বাবু + আনি = বাবুয়ানি
শুন্ + আনি = শুনানি
বেত + আনো = বেতানো
পাগল + আমি = পাগলামি
ভিখ + আরি = ভিখারি
বোমা + আরু = বোমারু
মাত্ + আল = মাতাল
রস + আলো = রসালো

চাষ + ই = চাষি
ভাজ্ + ই = ভাজি
দিন + ইক = দৈনিক
পঠ্ + ইত = পঠিত
নীল + ইমা = নীলিমা
জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে
পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল
চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু
প্রাণ + ঈ = প্রাণী
গ্রাম + ঈন = গ্রামীণ
রাষ্ট্র + ঈয় = রাষ্ট্রীয়
ঝাড়্ + উ = ঝাড়ু
পেট + উক = পেটুক
লেজ + উড় = লেজুড়
পড়্ + উয়া = পড়ুয়া
ঘর + ওয়া = ঘরোয়া
বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা
জাদু + কর = জাদুকর
ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা
জ্ঞা + ত = জ্ঞাত
কৃ + তব্য = কর্তব্য

প্রিয় + তম = প্রিয়তম

দীর্ঘ + তর = দীর্ঘতর

সরল + তা = সরলতা

কাট্ + তি = কাটতি

বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব

অংশী + দার = অংশীদার

কাঁদ্ + না = কান্না

গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা

ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ

দয়া + বান = দয়াবান

বুদ্ধি + মান = বুদ্ধিমান

সুন্দর + য = সৌন্দর্য

মধু + র = মধুর

মেঘ + লা = মেঘলা

মানান + সই = মানানসই

পানি + সে = পানসে

প্রত্যয় দিয়ে শব্দ বানাই

নিচে বাম কলামে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, আর ডান কলামে কিছু প্রত্যয় দেওয়া আছে। বাম কলামের শব্দের পরে ডান কলামের প্রত্যয় যোগ করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো। যেমন: বাম কলাম থেকে 'ফুল' আর ডান কলাম থেকে 'দানি' নিয়ে 'ফুলদানি' শব্দটি তৈরি করতে পারো।

বাম কলাম	ডান কলাম
ঢাকা	আ
ফুল	অনীয়
কর্	আই
দয়া	দানি
কলম	ওয়ালা
দরিদ্র	তা
গুরু	ত্ব
বুদ্ধি	দার
চল্	বান
পাহারা	মান

অনুচ্ছেদ লিখে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ খুঁজি

কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। লেখা হয়ে গেলে প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত শব্দগুলোর নিচে দাগ দাও।

৩য় পরিচ্ছেদ

শব্দের অর্থ

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

সাধারণভাবে শব্দের একটি মূল অর্থ থাকে। একে বলা হয় মুখ্য অর্থ। যেমন, 'কাটা' শব্দ দিয়ে মূলত বোঝায় কোনো কিছু কেটে ফেলা। এখানে কেটে ফেলা হলো 'কাটা' শব্দের মুখ্য অর্থ।

মুখ্য অর্থের বাইরেও একটি শব্দের একাধিক গৌণ অর্থ থাকতে পারে। যেমন, 'মেঘ কেটে গেছে' বাক্যে 'কাটা শব্দের অর্থ 'সরে যাওয়া'। আবার, 'টিকিট কাটতে হবে' বাক্যে কাটা শব্দের অর্থ 'কেনা'। কাটা শব্দের এই 'সরে যাওয়া' ও 'কেনা' অর্থগুলো গৌণ অর্থ।

নিচে কয়েকটি শব্দের মুখ্য অর্থ ও একাধিক গৌণ অর্থের প্রয়োগ দেখানো হলো।

খাওয়া	মুখ্য অর্থ	আহার করা	(সময়মতো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।)
	গৌণ অর্থ ১	পান করা	(সে চা খাচ্ছে।)
	গৌণ অর্থ ২	নেওয়া	(লোকটি ঘুস খেয়ে জেলে আছে।)
গরম	মুখ্য অর্থ	উত্তপ্ত	(কামার গরম লোহা পিটিয়ে দা বানায়।)
	গৌণ অর্থ ১	উগ্র	(কোনো কারণে তার মেজাজ গরম হয়ে আছে।)
	গৌণ অর্থ ২	চড়া	(কয়েকদিন ধরে মাছের বাজার গরম।)
	গৌণ অর্থ ৩	টাটকা	(আজকের গরম খবরটা জানেন?)
	গৌণ অর্থ ৪	শীত নিবারক	(বাইরে ঠান্ডা, গরম কাপড় পরে বের হও।)
ঘর	মুখ্য অর্থ	গৃহ	(ভূমিহীনদের ঘর দেওয়া হয়েছে।)
	গৌণ অর্থ ১	কক্ষ	(ও পড়ার ঘরে আছে।)
	গৌণ অর্থ ২	ছক	(সাদা ঘরে দাবার বোড়েটাকে এগিয়ে নাও।)
	গৌণ অর্থ ৩	পরিবার	(সেখানে একঘর কুমোর বাস করে।)

পথ	মুখ্য অর্থ	রাস্তা	(পথের পাশে একটা বিশাল বটগাছ।)
	গৌণ অর্থ ১	উপায়	(সমস্যাটি সমাধানের পথ খোঁজো।)
	গৌণ অর্থ ২	দিক	(বাংলাদেশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।)
নাম	মুখ্য অর্থ	নামকরণ	(তার নাম নয়নতারা।)
	গৌণ অর্থ ১	খ্যাতি	(তার অনেক নাম শুনেছি।)
	গৌণ অর্থ ২	লক্ষণ	(বৃষ্টি থামার নাম নেই।)
	গৌণ অর্থ ৩	বাহানা	(কাজের নামে শুধু ঘোরাঘুরি!)
ভার	মুখ্য অর্থ	ওজন	(বস্তাটার ভার অনেক বেশি।)
	গৌণ অর্থ ১	বেজার	(মুখ ভার করে রয়েছ কেন?)
	গৌণ অর্থ ২	চাপ	(ঋণের ভারে লোকটি জর্জরিত।)
	গৌণ অর্থ ৩	দায়িত্ব	(সংসারের ভার সে একা টানছে।)
	গৌণ অর্থ ৪	দুঃসাধ্য	(এই বেতনে মাস চালানো ভার।)

অর্থ বুঝে বাক্য লিখি

নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করে মুখ্য অর্থ এবং এক বা একাধিক গৌণ অর্থের প্রয়োগ দেখাও।

১. পাকা	মুখ্য অর্থ	....
	গৌণ অর্থ ১	....
	গৌণ অর্থ ২	....

২. ধরা	মুখ্য অর্থ	....
	গৌণ অর্থ ১	....
	গৌণ অর্থ ২	....
৩. কথা	মুখ্য অর্থ	....
	গৌণ অর্থ ১	....
	গৌণ অর্থ ২	....
৪. বড়ো	মুখ্য অর্থ	....
	গৌণ অর্থ ১	....
	গৌণ অর্থ ২	....
৫. মুখ	মুখ্য অর্থ	....
	গৌণ অর্থ ১	....
	গৌণ অর্থ ২	....
৬. পাগল	মুখ্য অর্থ	....
	গৌণ অর্থ ১	....
	গৌণ অর্থ ২	....

সহপাঠীর লেখা বাক্যের সঙ্গে তোমার বাক্যগুলো মিলিয়ে দেখো।

প্রতিশব্দ

অন্ধকার	পাথর	তরঙ্গ	অশ্ব	নিকৃষ্ট
দুঃখ	চুল	বৃক্ষ	পাড়	তিমির
গাছ	ঘোড়া	আঁধার	শশী	চিকুর
কূল	চন্দ্র	তীর	তরু	প্রস্তর
মন্দ	ঢেউ	অলক	খারাপ	যন্ত্রণা
চাঁদ	শিলা	কষ্ট	ঊর্মি	ঘোটক

উপরের ছক থেকে একই রকম অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দগুলো আলাদা করো। একটি নমুনা করে দেখানো হলো।

১. অন্ধকার আঁধার তিমির

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৭. ....

৮. ....

৯. ....

১০. ....

প্রতিশব্দ শিখি

প্রতিশব্দ বলতে বোঝায় এমন কিছু শব্দ যেগুলো কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন: 'গাছ' শব্দটি কখনো বৃক্ষ, কখনো তরু, কখনো উদ্ভিদ, কখনো লতা, আবার কখনো তৃণ বোঝায়। এখানে বৃক্ষ, তরু, উদ্ভিদ, লতা, তৃণ–এগুলো 'গাছ' শব্দের প্রতিশব্দ। প্রতিশব্দকে সমার্থক শব্দও বলে।

বাক্যে একটি শব্দের বদলে তার প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন, 'ডান দিকের রাস্তা দিয়ে যাও'–এই বাক্যের বদলে বলা যায় 'ডান দিকের পথ দিয়ে যাও'। তবে প্রতিশব্দ সবসময়ে বদলযোগ্য হয় না। যেমন, কেউ বলতে পারেন 'ধানগাছে পোকার আক্রমণ হয়েছে।' কিন্তু এর বদলে 'ধানবৃক্ষে পোকার আক্রমণ হয়েছে'–এমনটা কেউ বলেন না।

নিচে কিছু শব্দের প্রতিশব্দ দেওয়া হলো।

অকাল: অসময়, অবেলা, দুর্দিন, অশুভ সময়, দুঃসময়।

অতিথি: মেহমান, অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, আমন্ত্রিত, কুটুম।

অভাব: অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা, দুরবস্থা, অসচ্ছলতা।

আইন: বিধান, কানুন, ধারা, নিয়ম, বিধি।

একতা: ঐক্য, মিলন, অভেদ, অভিন্নতা।

কথা: উক্তি, বাক্য, বচন, কথন, বাণী, ভাষণ।

খাদ্য: খাবার, খানা, আহার, ভোজ্য, অন্ন, রসদ।

ঝড়: ঝঞ্ঝা, তুফান, সাইক্লোন, ঝটিকা, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়।

দয়া: অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, অনুকম্পা, মায়া।

দিন: দিবস, দিবা, বার, রোজ।

নদী: নদ, গাঙ, স্রোতস্বিনী, তটিনী, নির্ঝরিণী।

পাখি: পক্ষী, পঙ্খি, বিহঙ্গ, বিহগ, পাখপাখালি।

মন: অন্তর, দিল, পরান, চিত্ত, হৃদয়, অন্তঃকরণ।

যুদ্ধ: লড়াই, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, সমর, রণ।

সুন্দর: মনোরম, মনোহর, শোভন, রম্য, সুদর্শন, ললিত।

প্রতিশব্দ বসিয়ে আবার লিখি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো। এরপর এখানকার অন্তত দশটি শব্দের বদল ঘটিয়ে অনুচ্ছেদটি লেখো।

রাত্রি যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে। এ কথার মানে হলো বিপদ দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সেই সমস্যা সমাধানের উপায়ও আছে। পৃথিবীতে নানা রকম ঘটনা ঘটে বলেই পৃথিবী এত বৈচিত্র্যময়। দুঃখের ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনি আনন্দের ঘটনাও ঘটে। অন্যের দুঃখে দুঃখী হতে হয়, আর অন্যের আনন্দে আনন্দিত হতে হয়। তবে অনেক সময়ে নিজের বিপদের দিনে কাউকে পাশে পাওয়া যায় না। তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মেঘ কেটে যেমন সূর্য ওঠে, তেমনি দুঃসময় কেটে সুন্দর সময় আসে।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

বিপরীত শব্দ

দাগ দেওয়া শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

এই গ্লাসের পানি ঠান্ডা।	বাক্য: এই গ্লাসের পানি গরম।
তিনি শক্ত মনের মানুষ।	বাক্য: ....
কথাটি সত্য নয়।	বাক্য: ....
নতুন রাস্তাটি অনেক সরু।	বাক্য: ....
এ আয়নাতে সব ঝাপসা দেখা যায়।	বাক্য: ....
কাজটি যৌথভাবে করো।	বাক্য: ....
কাল দিনের বেলায় এসো।	বাক্য: ....
লোকটি কৃপণ।	বাক্য: ....
টেবিলে বইগুলো গোছানো আছে।	বাক্য: ....
আজকের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হলো।	বাক্য: ....

লক্ষ করো, বিপরীত শব্দ বসানোর ফলে বাক্যগুলোর অর্থ বদলে গেছে।

বিপরীত শব্দ বুঝি

এক জোড়া শব্দ যখন পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন একটিকে অন্যটির বিপরীত শব্দ বলে। যেমন: 'দিন' ও 'রাত'। এখানে দিনের বিপরীত শব্দ রাত এবং রাতের বিপরীত শব্দ দিন। একইভাবে, উঁচু ও নিচু, ভালো ও মন্দ, শক্ত ও নরম–এগুলো পরস্পর বিপরীত শব্দ।

বিপরীত শব্দের একটি হাঁ-বাচক হলে অন্যটি না-বাচক হয়। যেমন 'সুস্থ' ও 'অসুস্থ' শব্দজোড়ার মধ্যে সুস্থ হাঁ-বাচক এবং অসুস্থ না-বাচক। এজন্য বিপরীত শব্দের সাথে না যুক্ত করে বাক্যের অর্থ ঠিক রাখা যায়। যেমন: লোকটি সুস্থ। এই বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে এভাবেও বলা যায়: লোকটি অসুস্থ নয়।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
অচল	সচল
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
আদান	প্রদান
আদি	অন্ত
উপকার	অপকার
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
কল্পনা	বাস্তব
গ্রহণ	বর্জন
টাটকা	বাসি

শব্দ	বিপরীত শব্দ
দীর্ঘ	হ্রস্ব
নতুন	পুরাতন
নিন্দা	প্রশংসা
পূর্ব	পশ্চিম
বক্তা	শ্রোতা
বাদী	বিবাদী
ভোঁতা	ধারালো
সহজ	কঠিন
সৃষ্টি	ধ্বংস
স্বাধীন	পরাধীন

বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে বিপরীত শব্দ বসাই

এবার দাগ দেওয়া শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলো এমনভাবে লেখো যাতে বাক্যের অর্থ ঠিক থাকে। এজন্য বাক্যের শেষে না, নি, নেই, নয় ইত্যাদি বসানোর দরকার হবে। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

এই গ্লাসের পানি ঠান্ডা।	বাক্য: এই গ্লাসের পানি গরম নয়।
তিনি শক্ত মনের মানুষ।	বাক্য: ....
কথাটি সত্য নয়।	বাক্য: ....
নতুন রাস্তাটি অনেক সরু।	বাক্য: ....
এ আয়নাতে সব ঝাপসা দেখা যায়।	বাক্য: ....
কাজটি যৌথভাবে করো।	বাক্য: ....
কাল দিনের বেলায় এসো।	বাক্য: ....
লোকটি কৃপণ।	বাক্য: ....
টেবিলে বইগুলো গোছানো আছে।	বাক্য: ....
আজকের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হলো।	বাক্য: ....

৪র্থ পরিচ্ছেদ

যতিচিহ্ন

নিচের খালি ঘরগুলোতে যথাযথ বিরামচিহ্ন বসাও:

এক দেশে ছিল এক রাজা □

লোকটিকে মুদি দোকান থেকে চাল □ ডাল □ ডিম আর আলু কিনতে দেখলাম □

পারুল গল্প লেখে □ আমি কবিতা লিখি □

আপনি কখন এলেন □

বলো কী □ এই কলমের দাম একশ টাকা □

ভালো□মন্দ নিয়েই আমাদের সমাজ □

আমার বড়ো চাচা □ যিনি মালয়েশিয়ায় ছিলেন □ গতকাল বাড়ি ফিরেছেন □

প্রমিত ভাষার দুই রূপ □ কথ্য ও লেখ্য □

মা বললেন □ □তুমি দাঁড়াও □ আমি আসছি □□

বুঝতে চেষ্টা করি

সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করো।

যতিচিহ্ন কেন ব্যবহার করা হয়? ....

....

মুখের ভাষায় যতিচিহ্ন লাগে না কেন? ....

....

লেখার ভাষায় যতিচিহ্ন কেন দিতে হয়? ....

....

বাক্যের শেষে কোন কোন যতিচিহ্ন বসে? ....

....

বাক্যের ভিতরে কোন কোন যতিচিহ্ন বসে? ....

....

যতিচিহ্ন

আমরা কথা বলার সময়ে মাঝে মাঝে থামি। এই থামার মাধ্যমে কথার অর্থ স্পষ্ট হয়। কথাকে লিখিত রূপ দেওয়ার সময়ে এই থামা বোঝানার জন্য কিছু সংকেত ব্যবহার করা হয়। এই সংকেতগুলোর নাম যতিচিহ্ন। যেমন: দাঁড়ি (।), কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), ড্যাশ (–) ইত্যাদি।

কোনো কোনো যতিচিহ্ন কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামাকেও নির্দেশ করে। যেমন: প্রশ্নচিহ্ন (?) ও বিস্ময়চিহ্ন (!)। যেমন: তুমি উটপাখি দেখেছ? তুমি উটপাখি দেখেছ! এখানে প্রথম বাক্যটি প্রশ্ন বোঝাচ্ছে, পরের বাক্যটি বিস্ময় বোঝাচ্ছে।

কোন যতিচিহ্নের কী কাজ

(১) দাঁড়ি (।)

বিবৃতিবাচক বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। যেমন:

তারা মাঠে খেলছে।

তোমার বইটা আমাকে পড়তে দিও।

(২) কমা (,)

কমা দিয়ে কোনো বাক্য শেষ হয় না। কমা বাক্যের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে। যেমন:

এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

এক ধরনের কয়েকটি শব্দ পরপর থাকলে কমা দিতে হয়। যেমন:

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম, জাম, কাঁঠাল পাকে।

(৩) সেমিকোলন (;)

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি বাক্যের মাঝে সেমিকোলন হয়। যেমন:

ভোর হয়েছে; চলো হাঁটতে যাই।

(৪) প্রশ্নচিহ্ন (?)

প্রশ্নবাচক বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন:

তোমার নাম কী?

(৫) বিস্ময়চিহ্ন (!)

আবেগ শব্দ ও আবেগবাচক বাক্যের শেষে বিস্ময়চিহ্ন বসে। যেমন:

বাহ্!

সত্যিই তুমি ভালো খেলেছ!

(৬) হাইফেন (-)

একজোড়া শব্দের মাঝখানে হাইফেন বসে। যেমন:

লাল-সবুজের পতাকা উড়ছে।

(৭) ড্যাশ (–)

হাইফেন যেমন দুটি শব্দকে এক করে, তেমনি ড্যাশ দুটি বাক্যকে এক করে। হাইফেনের চেয়ে ড্যাশ আকারে বড়ো হয়। যেমন:

যদি যেতে চাও যাও–আমার কিছু বলার নেই।

(৮) কোলন (:)

উদাহরণ দেওয়ার আগে কোলন বসে। যেমন:

বাংলা বর্ণ দুই রকম, যথা: স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।

নাটকের সংলাপে কোলন বসে। যেমন:

হাসু: চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।

(৯) উদ্ধারচিহ্ন (‘ ’)

বক্তার কথা সরাসরি বোঝাতে উদ্ধারচিহ্ন বসে। যেমন:

তিনি বললেন, ‘আমি গতকাল রাতের ট্রেনে ঢাকা এসেছি।’

বইয়ের নামে উদ্ধারচিহ্ন বসে। যেমন:

কাজী নজরুল ইসলামের একটি কাব্যের নাম ‘সাম্যবাদী’।

(১০) বিন্দু (.)

শব্দ সংক্ষেপ করে লিখতে অনেক সময়ে বিন্দু ব্যবহার করা হয়। যেমন:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (এখানে ড. দিয়ে ‘ডক্টর’ বোঝানো হচ্ছে।)

কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে

আবেগ শব্দ ও আবেগবাচক বাক্যের শেষে	
উদাহরণ দেওয়ার আগে	
এক ধরনের কয়েকটি শব্দ পরপর থাকলে	
একজোড়া শব্দের মাঝখানে	
দুটি বাক্যকে এক করতে	
নাটকের সংলাপে চরিত্রের নামের পরে	
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি বাক্যের মাঝে	
প্রশ্নবাচক বাক্যের শেষে	
বইয়ের নামে	
বক্তার কথা সরাসরি বোঝাতে	
বাক্যের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করতে	
বিবৃতিবাচক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের শেষে	
শব্দ সংক্ষেপ করার কাজে	

যতিচিহ্ন বসাই

নিচের অনুচ্ছেদে কিছু যতিচিহ্ন বসানো আছে, কিছু যতিচিহ্ন বসানো নেই। বাদ পড়া যতিচিহ্নগুলো বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখো:

আকমল স্যার সেদিন ক্লাসে এসে বললেন, শোনো ছেলে মেয়েরা, তোমাদের জন্য একটা খুশির খবর আছে

সব শিক্ষার্থী খুশির খবরটা শোনার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। স্যার বললেন, স্কুল থেকে প্রতিটি শ্রেণিতে একটি করে বুক-সেলফ দেওয়া হচ্ছে

বিনু বলল বুক-সেলফ দিয়ে কী হবে, স্যার?

স্যার বললেন, এই বুক-সেলফে আমরা নানা রকম বই রাখব। গল্প কবিতা প্রবন্ধ নাটক পছন্দমতো যে কোনো ধরনের বই আমরা রাখতে পারি।

শানু প্রশ্ন করল বইগুলো আমরা কোথায় পাব, স্যার

স্যার বললেন, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে বই জমা দেবে সেসব বই এই সেলফে থাকবে। এভাবে আমরা একটি ক্লাসরুম লাইব্রেরি গড়ে তুলব এই সেলফ থেকে বই নিয়ে সবাই পড়তে পারবে।

মিতু খুশি খুশি গলায় বলল, বাহ্ দারুণ হবে

যতিচিহ্ন ব্যবহার করে অনুচ্ছেদ লিখি

একটি অনুচ্ছেদ লেখো যেখানে বিভিন্ন রকম যতিচিহ্নের ব্যবহার আছে।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৫ম পরিচ্ছেদ

বাক্য

১. চেষ্টা করলে সফল হবে।

২. যদি চেষ্টা করো, তবে সফল হবে।

৩. চেষ্টা করো, সফল হবে।

বুঝতে চেষ্টা করি

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করো।

উপরের বাক্যগুলো একই অর্থ প্রকাশ করছে কি না?

....

....

বাক্য তিনটির গঠন এক রকমের কি না?

....

....

কোন বাক্যে কেবল একটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে?

....

....

কোন বাক্যের একটি অংশ অন্য অংশের সাহায্য ছাড়া পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে না?

....

....

কোন বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া আছে?

....

....

বিভিন্ন ধরনের বাক্য

গঠন অনুযায়ী বাংলা বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য: যেসব বাক্যে কেবল একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, সেগুলো সরল বাক্য।
উদাহরণ: শফিক বল খেলে।

তুমি খেলে আমি খুশি হব।

জটিল বাক্য: যেসব বাক্যের একটি অংশ অন্য অংশের সাহায্য ছাড়া পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, সেসব বাক্যকে জটিল বাক্য বলে। জটিল বাক্যের দুটি অংশ কিছু জোড়া শব্দ দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে; যেমন: যে-সে, যিনি-তিনি, যারা-তারা, যাঁরা-তাঁরা, যদি-তবে, যেহেতু-সেহেতু, যখন-তখন, যত-তত ইত্যাদি।
উদাহরণ: যে ছেলেটি গতকাল এসেছিল, সে আমার ভাই।

যখন বৃষ্টি নামল, তখন আমরা দৌড় দিলাম।

যৌগিক বাক্য: একাধিক বাক্য যখন যোজক দিয়ে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে।
উদাহরণ: সীমা বই পড়ছে আর হাবিব ঘর গুছাচ্ছে।

এখানে, 'সীমা বই পড়ছে' একটি বাক্য এবং 'হাবিব ঘর গুছাচ্ছে' আরেকটি বাক্য। বাক্য দুটি 'আর' যোজক দিয়ে যুক্ত হয়েছে। এখানে সমাপিকা ক্রিয়া দুটি হলো: পড়ছে, গুছাচ্ছে।

খুঁজে বের করি

নিচে তিন ধরনের বাক্যের নমুনা দেওয়া হলো। এগুলো কোন ধরনের বাক্য এবং তার কারণ কী, তা খুঁজে বের করো। প্রথমটি করে দেখানো হলো।

১. শাহেদ বই পড়ছে।

এটি একটি সরল বাক্য। কারণ, এখানে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়াটি হলো: পড়ছে।

২. যদি আমার কথা শোনো, তবে তোমার ভালো হবে।

এটি একটি জটিল বাক্য। কারণ, এখানে জোড়া শব্দ আছে। সেই জোড়া শব্দ হলো: যদি-তবে।

৩. অনেক খুঁজলাম, তবু ঘড়িটি খুঁজে পেলাম না।

এটি একটি যৌগিক বাক্য। কারণ, এখানে দুটি বাক্য একটি যোজক দিয়ে যুক্ত। সেই যোজকটি হলো: তবু। আর এখানে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সমাপিকা ক্রিয়া দুটি হলো: খুঁজলাম, পেলাম।

৪. তুমি কোথা থেকে এসেছ?

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

৫. যেমন কাজ করেছ, তেমন ফল পেয়েছ।

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

৬. আমি সকালে হাঁটি, আর তিনি বিকালে হাঁটেন।

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

৭. সে ভাত খেয়ে স্কুলে গেল।

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

৮. আমি পড়াশোনা শেষ করব, তারপর খেলতে যাব।

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

৯. যখন তুমি আসবে, তখন আমরা রান্না শুরু করব।

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

১০. আজ ভোরে সুন্দর একটা পাখি দেখতে পেলাম।

এটি একটি .... বাক্য। কারণ, ...

....

বাক্য তৈরি করি

নিচের খালি জায়গায় দুটি করে সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য তৈরি করো:

সরল বাক্য ১: ....

....

সরল বাক্য ২: ....

....

জটিল বাক্য ১: ....

....

জটিল বাক্য ২: ....

....

যৌগিক বাক্য ১: ....

....

যৌগিক বাক্য ২: ....

....

চতুর্থ অধ্যায়

চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের লেখার সাথে পরিচিত হয়েছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিতরে-বাইরে, রাস্তার আশেপাশে, টেলিভিশনে, খবরের কাগজে, এমনকি বিভিন্ন আকারের কাগজে, কাপড়ে বা ধাতব পাতে আমরা এ ধরনের লেখা দেখতে পাই। এখানে এ রকম কিছু লেখার নমুনা দেওয়া হলো।

ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করি

ছবিগুলো দেখো এবং ছবির নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

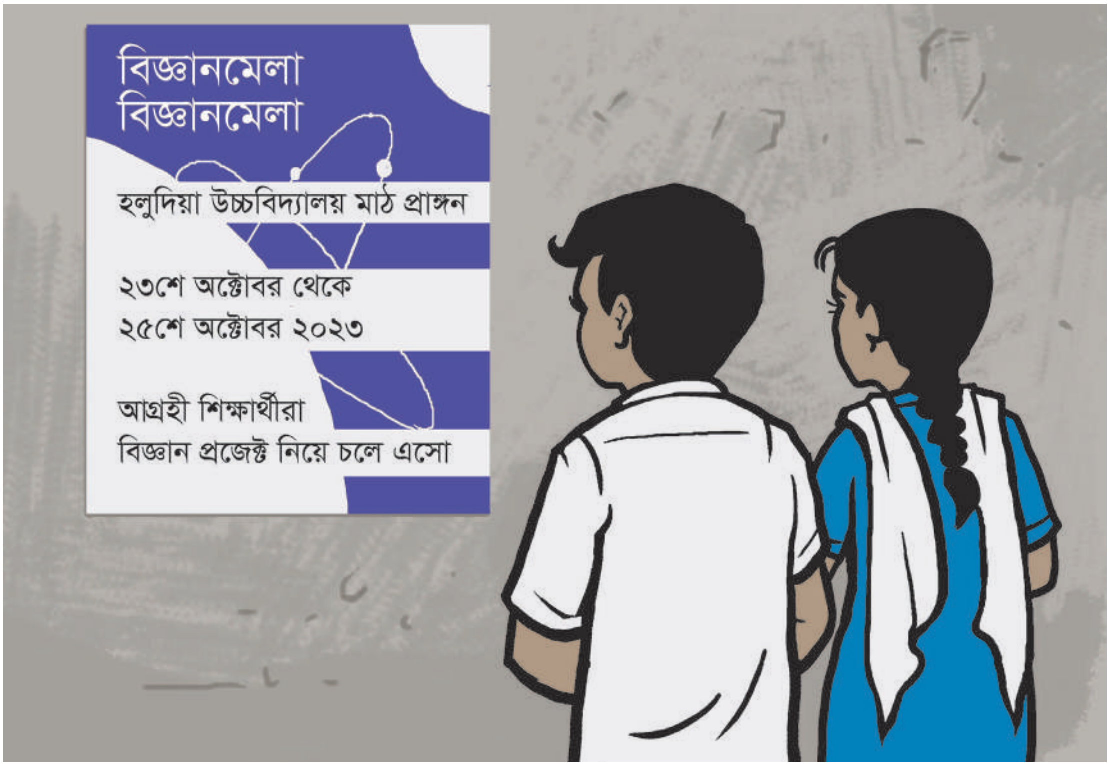

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

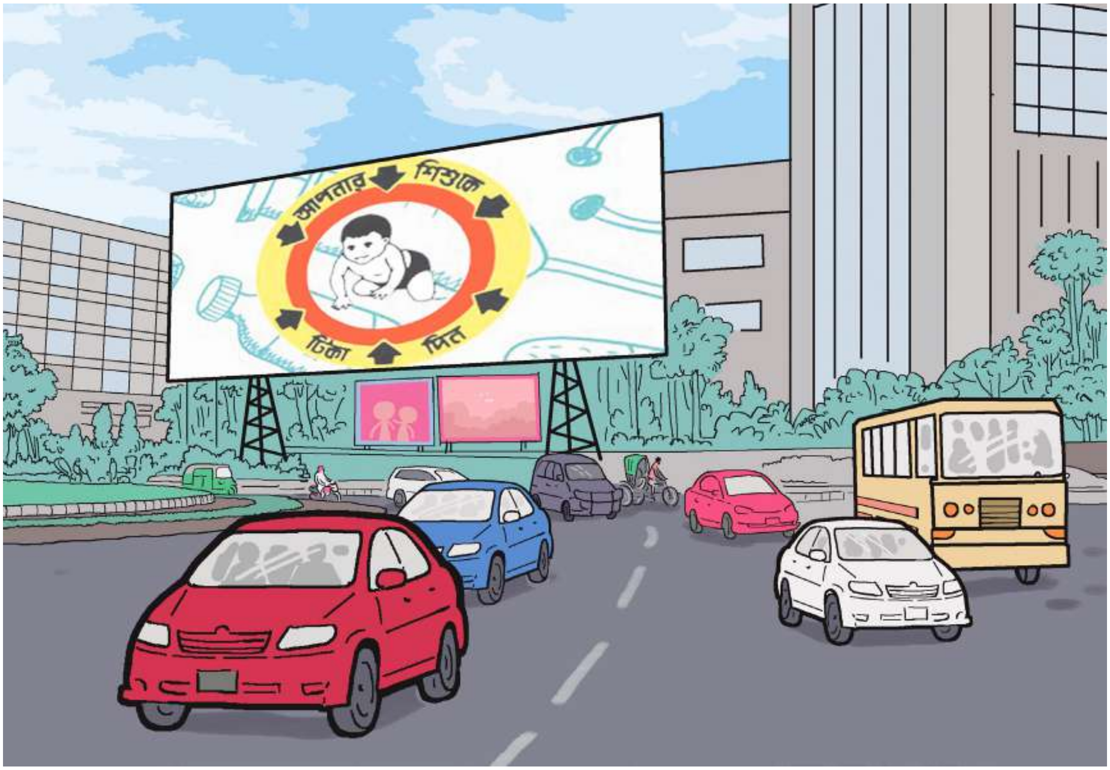

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

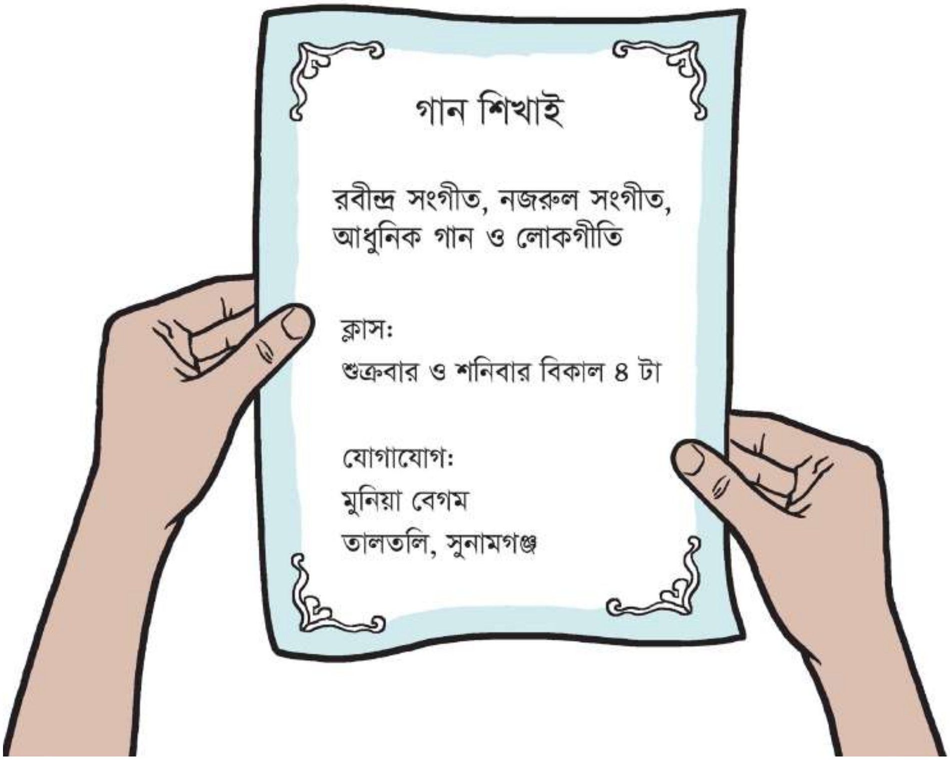

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

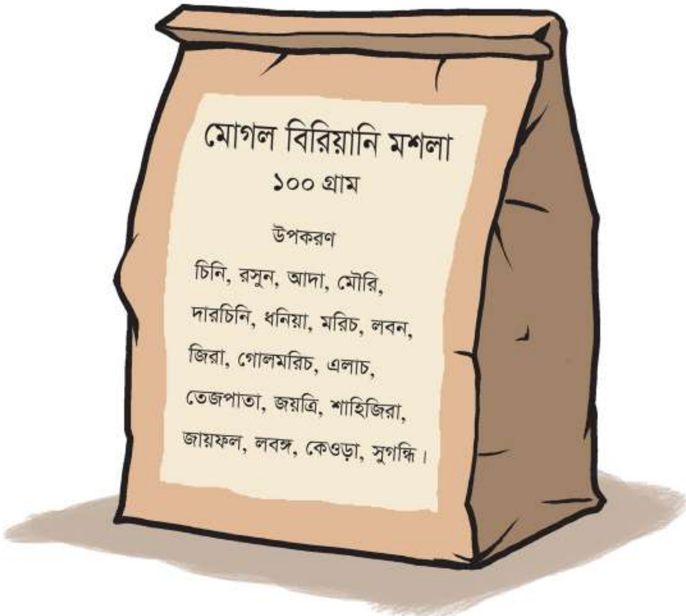

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

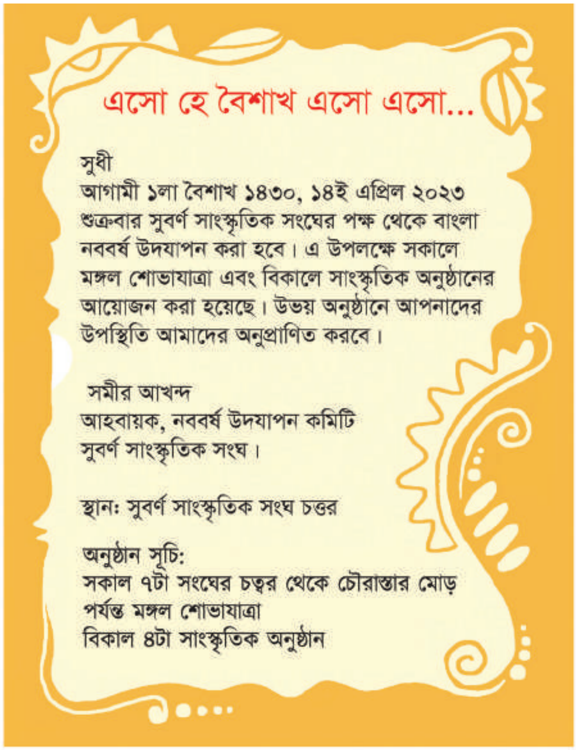

এসো হে বৈশাখ এসো এসো...

সুধী
আগামী ১লা বৈশাখ ১৪৩০, ১৪ই এপ্রিল ২০২৩ শুক্রবার সুবর্ণ সাংস্কৃতিক সংঘের পক্ষ থেকে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উভয় অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

সমীর আখন্দ
আহবায়ক, নববর্ষ উদযাপন কমিটি
সুবর্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ।

স্থান: সুবর্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ চত্তর

অনুষ্ঠান সূচি:
সকাল ৭টা সংঘের চত্বর থেকে চৌরাস্তার মোড় পর্যন্ত মঙ্গল শোভাযাত্রা
বিকাল ৪টা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এটি কী নামে পরিচিত?

....

এর ব্যবহার কী?

....

....

....

....

....

এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?

....

....

চারপাশের নানা রকম লেখা

উপরে যেসব নমুনা রয়েছে, সেগুলো দেখতে সবসময়ে এক রকম হয় না। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এগুলোর আকার, রং ও উপাদান ভিন্ন রকম হতে পারে। এগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো।

১. ব্যানার : ব্যানার সাধারণত আয়তাকার হয়ে থাকে। লম্বা কাপড়ে কিংবা কাপড়ের মতো প্লাস্টিক-পর্দায় বেশিরভাগ ব্যানার দেখা যায়। মিছিল বা শোভাযাত্রার সামনে, কোনো অনুষ্ঠানে মঞ্চের পেছনে, মেলা বা অস্থায়ী হাট-বাজারের সামনে ব্যানার দেখতে পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট তথ্য জানানোর কাজে এবং প্রচার-প্রচারণায় ব্যানারের ব্যবহার হয়। আজকাল অনুষ্ঠান-মঞ্চের পেছনে ডিজিটাল ব্যানারও দেখা যায়।

২. ফেস্টুন : ফেস্টুন দেখতে আয়তাকার; তবে এগুলো সাধারণত উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ফেস্টুনের উপকরণ ব্যানারের মতো। ফেস্টুন ঝুলিয়ে রাখা হয় সাধারণত ভবনের দেয়ালে, অনুষ্ঠান-মঞ্চের দুই পাশে, কোনো গাছে বা খুঁটিতে। এর মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণার কাজ হয়।

৩. পোস্টার : পোস্টার সাধারণত কাগজে মুদ্রিত বা হাতে লেখা হয়ে থাকে। এগুলো আকারে ব্যানার বা ফেস্টুনের মতো বড়ো নয়। রাস্তার ধারের দেয়ালে বা অনেক ভবনের গায়ে পোস্টার আঠা দিয়ে লাগানো হয়। নির্বাচনের সময়ে রাস্তায় দড়ি দিয়েও পোস্টার ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রচারের কাজে পোস্টারের ব্যবহার হয়। পোস্টারের মাধ্যমে রাজনৈতিক বক্তব্য বা দাবিও তুলে ধরা হয়ে থাকে।

৪. প্ল্যাকার্ড : শক্ত কাগজে, ধাতব পাতে, কাঠে, কাপড়ে, কিংবা কাপড়ের মতো প্লাস্টিক-পর্দায় বক্তব্য লিখে প্ল্যাকার্ড তৈরি করা হয়। প্ল্যাকার্ড উঁচু করে ধরার জন্য একটি লম্বা হাতল থাকে। মিছিলে বা শোভাযাত্রায় অংশকারীদের প্ল্যাকার্ড বহন করতে দেখা যায়। দাবি তুলে ধরা বা তথ্য জানানোর কাজে প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার হয়।

৫. বিলবোর্ড : সাধারণত বড়ো ধাতব পাত দিয়ে বিলবোর্ড তৈরি করা হয়। রাস্তার পাশে, ভবনের ছাদে বিলবোর্ড দেখা যায়। প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের কাজে এর ব্যবহার হয়। বিলবোর্ডের বক্তব্য ও ছবি ধাতব পাতে যেমন লেখা ও আঁকা হয়ে থাকে, তেমনি টেলিভিশনের মতো ডিজিটাল বিলবোর্ডও দেখা যায়। বিলবোর্ডের আরেক নাম হোর্ডিং।

৬. নোটিশ : স্কুল-কলেজে বা অফিস-আদালতে শিক্ষার্থী বা সাধারণ মানুষকে তথ্য জানানোর কাজে নোটিশ তৈরি হয়। নোটিশের মধ্যে কোনো কিছু মান্য করা বা পালন করার নির্দেশ থাকে। সাধারণত এটি হাতে লেখা হয় বা মুদ্রিত হয়। যেখানে নোটিশ টাঙানো থাকে, তার নাম নোটিশবোর্ড। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক সময়ে নোটিশ পাঠ করে শোনানো হয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠির আকারেও নোটিশ পাঠাতে পারে। আজকাল ইমেইলে ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে নোটিশ পাঠানো হয়ে থাকে। নোটিশের আরেক নাম বিজ্ঞপ্তি।

৭. **লিফলেট** : তথ্য ও পণ্যের প্রচারের কাজে লিফলেট তৈরি হয়। লিফলেট সাধারণত ছোটো কাগজে মুদ্রিত হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজের সামনে, হাট-বাজারে, ব্যস্ত এলাকায় অনেককে লিফলেট বিলি করতে দেখা যায়।

৮. **মোড়কের লেখা:** সাধারণত কাগজ বা পাতলা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ক বা প্যাকেট তৈরি হয়। এর গায়ে পণ্যের নাম ছাড়াও অনেক তথ্য থাকে। যেমন: প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা, পণ্যের উপাদান-উপকরণ ও পরিমাণ, দাম, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি। মোড়ককে আকর্ষণীয় করতে এর গায়ে নানা রকম ছবিও মুদ্রিত হতে দেখা যায়।

৯. **বিজ্ঞাপন** : বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে পণ্য বা তথ্য সম্পর্কে সবাইকে জানাতে বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়। বিজ্ঞাপন যেমন মুদ্রিত হয়, তেমনি রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনো বিষয় বা পণ্য সম্পর্কে জানা যেতে পারে। পণ্যের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়, তা অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে।

১০. **আমন্ত্রণপত্র** : অনুষ্ঠান-উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যে চিঠি লেখা হয়, তাকে আমন্ত্রণপত্র বলে। আমন্ত্রণপত্র সাধারণত কোনো খামে ভরে পাঠানো হয়। এগুলো হাতে লেখা হতে পারে, ছাপানো হতে পারে, এমনকি ডিজিটাল মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে। আমন্ত্রণপত্রে অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম-পরিচয় থাকে, এমনকি কবে, কখন, কোথায় অনুষ্ঠানটি হতে যাচ্ছে, এসব তথ্যও জানা যায়।

নিজেরা করি

কয়েকজন সহপাঠী মিলে দলগতভাবে উপরের নমুনাগুলোর মতো করে নতুন নমুনা তৈরি করো। এক্ষেত্রে শুধু নমুনার লেখাগুলো তৈরি করতে হবে। লেখার আগে আলোচনা করে ঠিক করে নাও কোন প্রয়োজনে এবং কাদের জন্য নমুনাটি তৈরি করা হচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বুঝে পড়ি লিখতে শিখি

১ম পরিচ্ছেদ

প্রায়োগিক লেখা

আগের শ্রেণিতে আমরা রোজনামচার কথা জেনেছি। অনেকে নিয়মিত রোজনামচা লেখেন, কেউ কেউ বিরতি দিয়ে হলেও রোজনামচা লেখেন। তুমি যদি খাতায় বা ডায়েরিতে রোজনামচা লিখে রাখো, তবে তা পরে তোমার কাজে লাগতে পারে। এমনকি সেসব লেখা পড়ে তখন তোমার নিজেরও ভালো লাগতে পারে।

চিঠিও এক ধরনের প্রায়োগিক লেখা। একসময়ে দূরবর্তী যোগাযোগের প্রধান উপায় ছিল এই চিঠি। পরিবারের লোকজনের কাছে কিংবা পরিচিত মানুষের কাছে চিঠি লিখে খবর জানানো হতো, আবার চিঠি লিখে খবর জানতে চাওয়া হতো। জবাবে তিনিও চিঠি লিখতেন। চিঠি সাধারণত খামে ভরে পাঠানো হয়। খামের উপরে বাম পাশে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও ডান পাশে প্রাপকের নাম-ঠিকানা লেখা হয়। চিঠির ব্যবহার ক্রমে কমে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে আজকাল বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল মাধ্যমে এ জাতীয় যোগাযোগের কাজ বেশি হচ্ছে।

নিচের চিঠিটি একজন মুক্তিযোদ্ধার। একাত্তরের রণাঙ্গন থেকে তিনি তাঁর মায়ের কাছে চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির লেখক: ফেরদৌস কামাল উদ্দীন মাহমুদ। আর চিঠির প্রাপক: হাসিনা মাহমুদ।

চিঠি

০৩/০৮/৭১

মা,

আমার সালাম নিয়ো। অনেক পর্বত, নদী প্রান্তর পেরিয়ে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তোমার ছেলে তার অনেক আকাঙ্ক্ষার শেষ ঠিকানা আজ খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ মা, আমি পৌঁছে গেছি আমার ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে। নিজেকে এবার প্রস্তুত করব প্রতিশোধ নেওয়ার এক বিশাল শক্তি হিসেবে। আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনো ভুলব না। ওদের উপযুক্ত জবাব আমাদের দিতেই হবে।

মা, তুমি এই মুহূর্তে আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। বিশাল বাবরি চুল, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। যদিও আমি নিজের চেহারাটা বহুদিন দেখি না কারণ এখানে কোনো আয়না নেই। মিহির বলে, আমাকে নাকি আফ্রিকার জংলিদের মতো লাগে। মিহির ঠিকই বলে, কারণ, এখন আমি নিজেই বুঝি আমার মাঝে একটি জংলি ভাব এসে গেছে। সেই আগের আমি আর নেই। তোমার মনে আছে মা, মুরগি জবাই করা দেখতে পারতাম না। আর সেই আমি আজ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটি।

খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে লাভ নেই, দুঃখ পাবে। তবে বেঁচে আছি ও খুব ভালো আছি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা আর সেই দিনটি থেকে খুব দূরে নাই, যখন আমরা আবার মুখোমুখি হব। দোয়া করো মা, যেন সেই দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকি। মনি ভাই আমাদের Officer করেনি কারণ ওনার অন্য কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে। এখানে আমার অনেক পুরানো বন্ধুর দেখা পেলাম। আমার আগের চিঠিটা হয়তো এত দিনে পেয়ে গেছ। সেলিম তোমার সাথে দেখা করে এসেছে, বলল। তোমরা ভালো আছ জেনে খুশি হলাম। আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। মায়ের দোয়া আমার সাথে আছে, আমার ভয় কী? অনেক লেখার ইচ্ছা করছে কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কত ঘটনা মনে জমা হয়ে আছে তোমাদের বলার জন্য! হয়তো অনেক বছর লেগে যাবে শেষ করতে। মন্টু চিঠি নিয়ে যাচ্ছে। পারলে ওকে একটু ভালো কিছু খাবারদাবার দিয়ো। অনেক দিন ও ভালো কিছু খায়নি। আজ তাহলে ৮০, সবাইকে সালাম ও দোয়া দিও।

তোমার স্নেহের ফেরদৌস।

শব্দের অর্থ

আকাঙ্ক্ষা: প্রত্যাশা।

৮০: ‘আসি’ বোঝাতে সংখ্যায় ৮০ লেখা হয়েছে।

প্রান্তর: বিস্তৃত মাঠ।

প্রাপক: যিনি পাবেন।

প্রেরক: যিনি পাঠান।

বাবরি চুল: কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই চিঠির প্রেরক ও প্রাপক কে? ....

....

....

খ. চিঠিটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লেখা? ....

....

....

গ. প্রেরক কেন চিঠিটি লিখেছেন? ....

....

....

....

....

ঘ. একটি চিঠির কোন অংশে কী লিখতে হয়? ....

....

....

....

....

ঙ. চিঠি কেন লেখা হয়? ....

....

....

....

বলি ও লিখি

উপরের চিঠিতে প্রেরক প্রাপককে যা যা জানাতে চেয়েছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

নিজের অভিজ্ঞতা

চিঠি পড়া, লেখা বা এ সংক্রান্ত তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে তা লেখো।

চিঠির বিবেচ্য

চিঠি লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়:

১. শুরুতে তারিখ এবং জায়গার নাম লিখতে হয়।

২. সম্বোধন দিয়ে চিঠি শুরু করতে হয়।

৩. চিঠির প্রথম দিকে বয়স অনুযায়ী সালাম, শুভেচ্ছা বা শুভাশিস জানাতে হয়।

৪. চিঠির বক্তব্য গুছিয়ে সহজ ভাষায় লিখতে হয়।

৫. শেষ অংশে বিদায় জানাতে হয় এবং নিজের নাম লিখতে হয়।

৬. চিঠি খামে ভরে প্রেরক ও প্রাপকের ঠিকানা লিখে ডাকে পাঠাতে হয়।

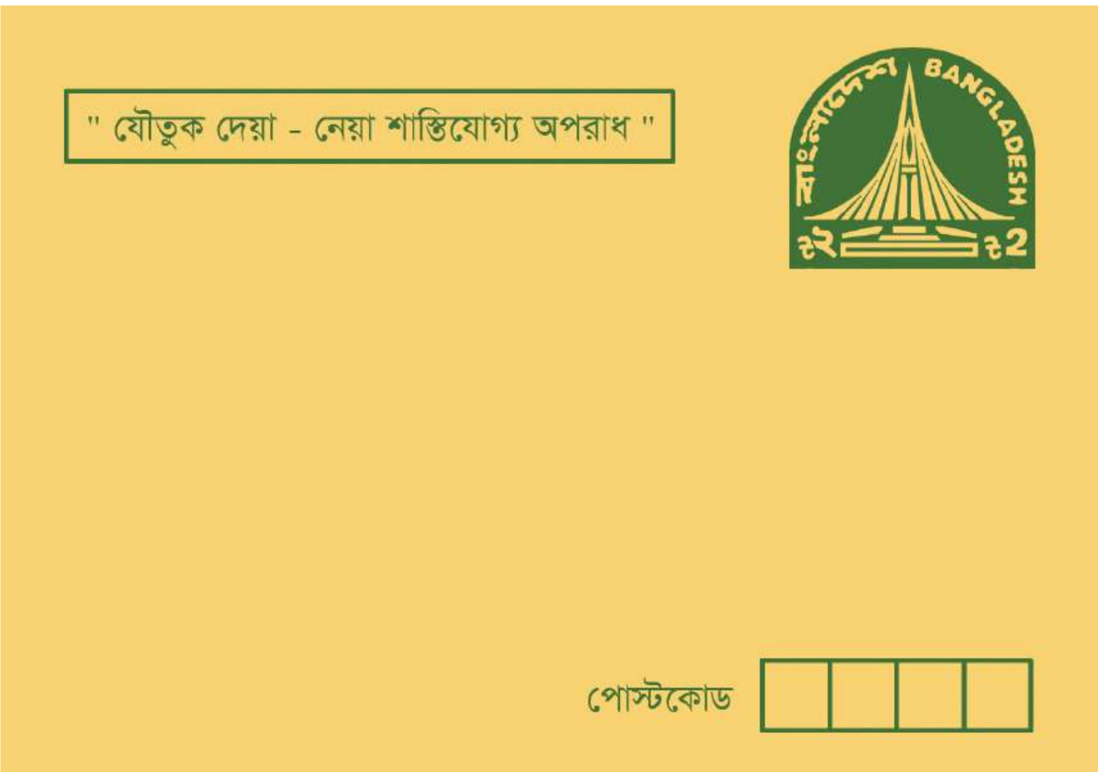

চিঠি লিখি

এবার তুমি একটি চিঠি লেখো। চিঠি কাকে লিখবে এবং কোন বিষয়ে লিখবে, আগে ভেবে নাও। লেখার সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো খেয়াল রেখো।

২য় পরিচ্ছেদ

বিবরণমূলক লেখা

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালে আসামের করিমগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। আফগানিস্তানের কাবুলে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এছাড়া মিশরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচনার একটি বড়ো অংশ ভ্রমণকাহিনি। সরস ভাষায় ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন 'দেশে-বিদেশে', 'জলে ডাঙায়'। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী', 'ময়ূরকণ্ঠী' ইত্যাদি। নিচের লেখাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর 'জলে ডাঙায়' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

পিরামিড

সৈয়দ মুজতবা আলী

পিরামিড! পিরামিড!! পিরামিড!!!

অনেক সময়ে আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা তিনটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন–!!!–দিই। তাই কি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটা পিরামিড? কিংবা উলটোটা? তিনটা পিরামিড ছিল বলে আমরা তিনবার আশ্চর্য হই? এই পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে যা গাদা গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে গেলেই একখানা আস্ত 'জলে-ডাঙায়' লিখতে হয়। কারণ এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ–যুগ যুগ ধরে মানুষ এদের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা করেছে, দেয়ালে-খোদাই লিপি উদ্ধার করে এদের সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। জানো তো, পিরামিডের ঠিক মাঝখানে একটা কুঠুরিতে বিস্তর ধনদৌলত জড়ো করা আছে-তারই পথ অনুসন্ধান করছে পাকা সাড়ে ছ হাজার বছর ধরে। ইরানি, গ্রিক, রোমান, আরব,

তুর্কি, ফরাসি, ইংরেজ পর পর সবাই এদেশ জয় করার পর প্রথমেই চেষ্টা করেছে পিরামিডের হাজার হাজার মন পাথর ভেঙে মাঝখানের কুঠুরিতে ঢুকে তার ধনদৌলত লুট করার। এবং আশ্চর্য, যিনি শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারলেন, তিনি ধন লুটের মতলবে ঢোকেননি। তিনি ঢুকেছিলেন নিছক ঐতিহাসিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য।

ফারাওয়ের রাজমিস্ত্রিরা কুঠুরি বানানো শেষ করার পরে বেরোবার সময়ে এমনই মস্ত পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে বাইরের দেয়ালে পালিশ পলেস্তারা লাগিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর মানুষের সাড়ে ছ হাজার বছর লাগল ভিতরে যাবার রাস্তা বের করতে!

মিশরের ভিতরে বাইরে আরও পিরামিড আছে কিন্তু গিজে অঞ্চলে যে তিনটা পিরামিডের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে সেগুলোই ভুবন-বিখ্যাত, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

রাজা	নির্মাণের সময়	ভূমিতে দৈর্ঘ্য	উচ্চতা
খুফু	৪৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব	৭৫৫ ফুট	৪৮১ ফুট
খাফরা	৪৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব	৭০৬ ফুট	৪৭১ ফুট
সেনকাওরা	৪৫৫০ খ্রিষ্টপূর্ব	৩৪৬ ফুট	২১০ ফুট

প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু বললে, না দেখে চট করে পিরামিডের উচ্চতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় না। এমনকি চোখের সামনে দেখেও ধারণা করা যায় না, এরা ঠিক কতখানি উঁচু। চ্যাপ্টা আকারের একটা বিরাট জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পাঁচশো ফুট উঁচু না হয়ে যদি চোঙার মতো একই সাইজ রেখে উঁচু হতো তবে স্পষ্ট বোঝা যেত পাঁচশো ফুটের উচ্চতা কতখানি উঁচু।

বোঝা যায় দূরে চলে গেলে। গিজে এবং কায়রো ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার পরও হঠাৎ চোখে পড়ে তিনটা পিরামিড সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। আর পিরামিড ছেড়ে যদি সোজা মরুভূমির ভিতর দিয়ে যাও, তবে মনে হবে সাহারার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পরও বুঝি পিরামিড দেখা যাবে!
তাই বোঝা যায়, এ বস্তু তৈরি করতে কেন তেইশ লক্ষ টুকরা পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। 'টুকরা' বলতে একটু কমিয়ে বলা হলো কারণ এর চার-পাঁচ টুকরা একত্র করলে একখানা ছোটোখাটো ইঞ্জিনের সাইজ এবং ওজন হয়। কিংবা বলতে পারো ছ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া করে এই পাথর নিয়ে একটা দেয়াল বানালে সে দেয়াল লম্বায় ছশো পঞ্চাশ মাইল হবে। অর্থাৎ সে দেয়াল কলকাতা থেকে দার্জিলিং গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে!

সব চেয়ে বড়ো পিরামিডটা বানাতে নাকি এক লক্ষ লোকের বিশ বৎসর লেগেছিল।

ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে লক্ষ লক্ষ লোককে বিশ বৎসর খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন। অন্য খরচের কথা বাদ দাও, এই এক লক্ষ লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য যে বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, সেটা গড়ে তোলা এবং তাকে বিশ বছর ধরে চালু রাখা তারাই করতে পারে, যারা সভ্যতার খুব একটা উঁচু স্তরে উঠে গিয়েছে।
এইবার আমরা পিরামিড নির্মাণের কারণের কাছে পৌঁছে গিয়েছি।

প্রথম কারণ সকলেরই জানা। ফারাওরা (সম্রাটরা) বিশ্বাস করতেন, তাঁদের শরীর যদি মৃত্যুর পর পচে যায়, কিংবা কোনো প্রকারের আঘাতে ক্ষয় হয় তবে তাঁরা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহকে 'মমি' বানিয়ে সেটাকে এমন একটা শক্ত পিরামিডের ভিতর রাখা হতো যে, তার ভিতরে ঢুকে কেউ যেন 'মমি'কে ছুঁতে পর্যন্ত না পারে। কিন্তু হায়, তাঁদের এ বাসনা পূর্ণ হয়নি। পূর্বেই বলেছি, হাজার হাজার বছর চেষ্টা করে দুষ্ট (অর্থাৎ ডাকাত) এবং শিষ্টেরা (অর্থাৎ পণ্ডিতেরা) শেষ পর্যন্ত তাঁদের গোপন কবরে ঢুকতে পেরেছেন। তাই করে অবশ্য গৌণত কোনো কোনো ফারাওয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে–পণ্ডিতেরা তাঁদের মমি সযত্নে জাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তাঁরা অক্ষত দেহে মহাপ্রলয়ের দিন গুনছেন, যেদিন তাঁরা নব দেহে নব যৌবন ফিরে পেয়ে অমৃতলোকে অনন্ত জীবন আরম্ভ করবেন।

শব্দের অর্থ

অনুসন্ধান করা: খোঁজ করা।

অমৃতলোক: স্বর্গ।

ঐশ্বর্য: সম্পদ।

কায়রো: মিশরের রাজধানী।

কীর্তিস্তম্ভ: কোনো কাজ বা ঘটনার স্মরণে তৈরি করা স্থাপনা।

কুঠুরি: ছোটো ঘর।

ক্ষীণ: সরু।

গিজে: কায়রোর একটি জায়গার নাম।

গৌণত: অপ্রধানভাবে।

চোঙা: ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে আসা গোল পাত্র।

জল্পনা-কল্পনা: নানা রকম চিন্তা ও অনুমান।

দেয়ালে-খোদাই লিপি: দেয়ালে খোদাই করা কোনো লেখা।

পরলোক: মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ।

পাকা খবর: প্রকৃত তথ্য।

পালিশ পলেস্তারা: মসৃণ প্রলেপ।

পিরামিড: বিশেষ আকৃতির প্রাচীন স্থাপনা।

প্রতাপ: ক্ষমতা।

ফারাও: মিশরের প্রাচীন রাজাদের উপাধি।

ফিরিস্তি: বিবরণ।

বিস্তর: অনেক।

মতলব: ফন্দি।

মনোবাঞ্ছা: মনের ইচ্ছা।

মমি: বিশেষ উপায়ে সংরক্ষিত মৃতদেহ।

মহাপ্রলয়ের দিন: পৃথিবী ধ্বংসের দিন।

রাজমিস্ত্রি: যাঁরা ইট, পাথর ইত্যাদি দিয়ে দালান তৈরির কাজ করেন।

সপ্তাশ্চর্য: পৃথিবীর সাতটি অবাক-করা নিদর্শন।

সাহারা: মরুভূমির নাম।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. লেখক এখানে কীসের বিবরণ দিয়েছেন? ....

....

....

....

খ. পিরামিডগুলো কারা তৈরি করেছিলেন এবং কখন তৈরি করেছিলেন? ....

....

....

....

গ. পিরামিডগুলো কেন তৈরি করা হয়েছিল? ....

....

....

ঘ. পিরামিডগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল? ....

....

....

....

ঙ. পিরামিড একটি পুরাকীর্তি। বাংলাদেশের যে কোনো পুরাকীর্তির সাথে এর মিল-অমিল খুঁজে বের করো। ....

....

....

....

....

....

বলি ও লিখি

‘পিরামিড’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

লেখা নিয়ে মতামত

‘পিরামিড’ রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো। বোঝার সুবিধার জন্যে দুটি নমুনা দেওয়া হলো।

‘পিরামিড’ রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১. এই তিনটে পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ	এ তথ্যটি সঠিক কি না যাচাই করতে হবে।
২. ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সে সম্রাটের কতখানি ঐশ্বর্য আর প্রতাপ ছিল, যিনি আপন রাজধানীর পাশে লক্ষ লক্ষ লোককে বিশ বৎসর খাওয়াতে-পরাতে পেরেছিলেন।	শুনেছি আগেকার রাজা-বাদশারা জোর করে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন ধরে এনে দাস হিসেবে কাজ করাতো, যা অত্যন্ত অমানবিক ছিল। পিরামিড বানানোর সময়ে এ ধরনের কিছু ঘটেছিল কি না জানতে হবে।
৩.	
৪.	

বিবরণ লেখার কৌশল

কোনো স্থান, বস্তু, বিষয় বা ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় যে ধরনের রচনায়, তাকে বিবরণমূলক লেখা বলে। ধরা যাক, পুকুরের ধারে লম্বা একটা তালগাছ তুমি দেখেছ। তুমি তার বিবরণ লিখতে পারো। বিবরণ লিখতে পারো জন্মদিনের সন্ধ্যার, কিংবা নিজের জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনার। নিজের চোখে দেখা বিষয় নিয়ে যেমন এ ধরনের লেখা তৈরি করা যায়, তেমনি অন্যের লেখা পড়ে বা অন্যের মুখে শুনেও বিবরণমূলক রচনা লেখা যায়।

বিবরণ লেখার জন্য বিষয়টি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা দরকার। এজন্য লেখা শুরু করার আগে বিষয়টি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হতে পারে, বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে, অথবা অভিজ্ঞ লোকের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এরপর ঠিক করতে হবে কীভাবে পুরো রচনাটি তুমি উপস্থাপন করতে চাও। ধরা যাক, তোমার দেখা তালগাছ নিয়ে তুমি একটি বিবরণমূলক লেখা তৈরি করতে চাও। তাহলে শুরুতে লিখতে পারো এ গাছটি তুমি কোথায় দেখেছ কিংবা এর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে কীভাবে। এরপর বলতে পারো তালগাছ দেখতে কেমন, কিংবা অন্য গাছের সঙ্গে এর মিল-অমিল কী। তালগাছের উপকারী দিকের খোঁজ-খবর নিয়ে তাও লিখতে পারো।

লেখার ভাষা সহজ-সরল রাখাই ভালো। বিবরণমূলক লেখায় আবেগ প্রকাশের ব্যাপারটি মুখ্য নয়, তবু তোমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি যুক্ত হতে পারে। মূল বিবরণের পাশাপাশি লেখার শুরু ও শেষটা যাতে আকর্ষণীয় হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। এ ধরনের লেখায় অনুচ্ছেদের সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে। বিষয় অনুযায়ী রচনাটির একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দিতে হয়।

বিবরণ লিখি

মানুষের তৈরি পুরানো কোনো স্থাপত্য নিদর্শনকে পুরাকীর্তি বলে। বাংলাদেশে অনেক পুরাকীর্তি আছে, যেগুলোর কোনো কোনোটি হাজার বছরের বেশি পুরানো। যেমন: বগুড়ার মহাস্থান গড়, নওগাঁর সোমপুর বিহার, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির, ঢাকার আহসান মঞ্জিল ইত্যাদি। তোমার এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো কোনো স্থাপত্য সম্পর্কে ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লেখো।

____

....

....

....

৩য় পরিচ্ছেদ

তথ্যমূলক লেখা

নিচে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে একটি লেখা দেওয়া হলো। এটি গোলাম মুরশিদের লেখা। গোলাম মুরশিদ ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে 'আশার ছলনে ভুলি', 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জগদীশচন্দ্র বসু

গোলাম মুরশিদ

নানা দেশে পৌঁছে গেছে বাঙালিরা। এমনকি, পৌঁছে গেছে চাঁদেও! নভোযানে করে যায়নি। তবে বাংলার নামটা চাঁদে পৌঁছে গেছে। চাঁদের গায়ে কালো কালো অনেক দাগ দেখা যায়। এগুলি আসলে বড়ো বড়ো গর্ত। এর মধ্যে একটা গর্তের নাম দেওয়া হয়েছে একজন বাঙালির নাম অনুসারে। তিনি একজন বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানীর নাম জগদীশচন্দ্র বসু।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি জন্মেছিলেন মুন্সিগঞ্জ জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে। অঞ্চলটি তখন বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল। এই বিজ্ঞানীর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে। কয়েক বছর পর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে অন্য জায়গায় চলে যান। তিনি মনে করতেন, লেখাপড়া শুরু করা উচিত মাতৃভাষা বাংলা দিয়ে। তারপরে ইংরেজি পড়া।

জগদীশ বাংলা ভাষায় তাঁর লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলেন। একটু বড়ো হয়ে তিনি কলকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। তারপর ভর্তি হন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখান থেকে তিনি ১৮৭৯ সালে বিএ পাশ করেন। এই কলেজে থাকাকালে তিনি ইউজিন লাফোঁ নামে একজন শিক্ষকের কাছাকাছি আসেন। এই শিক্ষক জগদীশের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। এই আগ্রহ পরবর্তী কালে তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাশ করার পর ১৮৮০ সালে ডাক্তারি পড়ার জন্য জগদীশ ইংল্যান্ডে যান। সেখানে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু লাশ-কাটা শিখতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন ইংল্যান্ডে ছিলেন আনন্দমোহন বসু। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি র‍্যাংলার। র‍্যাংলার হচ্ছে গণিতের সবচেয়ে উঁচু ডিগ্রি। তাঁর সাহায্যে জগদীশ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে কাজ করেন লর্ড র‍্যালে এবং অন্য কয়েকজন নাম-করা শিক্ষকের অধীনে। র‍্যালে পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। জগদীশ সাধারণ ডিগ্রি না করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস ডিগ্রি করেন ১৮৮৪ সালে। ঐ একই বছর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রিও লাভ করেন। কয়েক বছর পর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি ডিগ্রিও পান।

বিজ্ঞান কথাটার অর্থ আমরা জানি। যিনি বিজ্ঞান বিষয়ে লেখাপড়া করেছেন, তিনি হলেন বিজ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি করেছেন, তাঁকেও তাই বিজ্ঞানী বলা যায়। কিন্তু সত্যিকার বিজ্ঞানী বলে তাঁকে, যিনি কোনো না কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজ করেছেন; যেমন টেলিফোন আবিষ্কার।

জগদীশ ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেকগুলি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষ এসব জিনিসের কথা আগে জানত না। যেমন, বৈদ্যুতিক চুম্বক-তরঙ্গের কথা। এই তরঙ্গ এতটা লম্বা যে, তাকে কাজে লাগনো যায় না। জগদীশ খুব ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। একে বলে মাইক্রোওয়েভ। তিনি মাত্র ৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। এখন যে রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মাইক্রোওয়েভ কুকার ইত্যাদি দেখতে পাই, সেগুলো জগদীশ বসুর আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে।

১৮৯৪ সালে তিনি কলকাতার টাউন হলে তাঁর আবিষ্কারের কয়েকটা জিনিস প্রকাশ্যে দেখান। তিনি এক ঘরে বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে বিনা তারে অন্য ঘরে রাখা বারুদে আগুন লাগিয়ে দেন। বিনা তারে অন্য একটা ঘরে বেল অর্থাৎ ঘণ্টা বাজান।

তাঁর গবেষণার আর-একটা ক্ষেত্র হলো গাছপালা, উদ্ভিদ। এরা কথা বলতে পারে না, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে পারে না। কিন্তু এদের প্রাণ আছে, মানুষ তা অনুমান করত। তবে এরা যে মানুষের কাজে সাড়া দেয়, তা জানত না। ধরা যাক, মানুষ একটা লতার একটুখানি কেটে দিলো। লতাটা অমনি প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। কিন্তু এই কম্পন চোখে দেখা যায় না। সেটা মাপার জন্য জগদীশ একটা যন্ত্র তৈরি করেন। তার নাম ক্রেস্‌কোগ্রাফ। আর একটা উদাহরণ দিই। জানালার কাছে একটা চারা গাছ লাগালে, গাছটা যেদিক দিয়ে আলো আসছে সেদিকে বেঁকে যাবে। জগদীশ এটাও পরীক্ষা করে দেখান।

এখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন দেখা যায়। টেলিভিশনে কথা শোনা যায়, ছবিও দেখা যায়। রেডিওতে কেবল কথা শোনা যায়। রেডিওর মাধ্যমে বিনা তারে যোগাযোগের মূল কৌশলটি জগদীশ আবিষ্কার করেন ১৮৯৬ সালে। কাছাকাছি সময়ে ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কনি-ও একই কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। তবে কথা-বলা রেডিও আবিষ্কার হতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল।

অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্র বসুকে সম্মানসূচক ডিএসসি উপাধি দেয়। তিনি এফআরএস উপাধি পান। ব্রিটিশ সরকার ৫০ পাউন্ডের নোটে তাঁর ছবি ছাপে।

শব্দের অর্থ

অনুমান করা: আন্দাজ করা।

ইন্টারনেট: তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের সংযোগ-ব্যবস্থা।

এফআরএস: ফেলো অব দ্য রয়াল সোসাইটি; লন্ডনের বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান রয়াল সোসাইটি থেকে পাওয়া সম্মান।

ক্রেস্‌কোগ্রাফ: উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র।

ট্রাইপস ডিগ্রি: কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি।

ডিএসসি: ডক্টর অব সায়েন্স; বিজ্ঞান বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট: জেলা প্রশাসনের অধীন কর্মকর্তা।

নভোযান: রকেট।

নোবেল পুরস্কার: বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পাউন্ড: যুক্তরাজ্যের মুদ্রা।

প্রকাশ্যে: সবার সামনে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান: উদ্ভিদ, প্রাণী, পদার্থ, পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

মাইক্রোওয়েভ কুকার: মাইক্রোওয়েভ বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে যে যন্ত্রে রান্না করা হয়।

সাড়া: প্রতিক্রিয়া।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে এই লেখায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে?..

....

....

....

খ. এই লেখা থেকে সাল-ভিত্তিক তথ্যগুলো ছকের আকারে উপস্থাপন করো:

সাল	তথ্য
১৮৫৮	জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম

গ. এই ধরনের জীবন-তথ্যমূলক আর কী কী রচনা তুমি পড়েছ? ....

....

....

ঘ. এই লেখা থেকে জগদীশচন্দ্র বসুর কী কী আবিষ্কারের কথা জানতে পারলে? ....

....

....

....

....

ঙ. বিবরণমূলক লেখার সাথে তথ্যমূলক লেখার মিল-অমিল খুঁজে বের করো। ....

....

....

....

....

বলি ও লিখি

‘জগদীশচন্দ্র বসু’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

লেখা নিয়ে মতামত

'জগদীশচন্দ্র বসু' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো।

'জগদীশচন্দ্র বসু' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১.	
২.	

তথ্যমূলক লেখার কৌশল

তথ্য পরিবেশন করা যেসব লেখার মূল লক্ষ্য, সেগুলোকে তথ্যমূলক লেখা বলে। এ ধরনের লেখায় তথ্য পরিবেশনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। বইপত্র পড়ে, অনলাইনের মাধ্যমে কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য উপস্থাপনের সময়ে জানা তথ্যও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে মিলিয়ে নিতে হয়। তথ্যমূলক রচনাকে আকর্ষণীয় করার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা দরকার।

এ ধরনের লেখায় বিষয় অনুযায়ী একটি শিরোনাম থাকে। কোন তথ্যের পরে কোন তথ্য পরিবেশন করা হবে, তার একটি ধারাবাহিকতা রাখতে হয়। সাধারণত একই ধরনের তথ্য এক জায়গায় রাখা হয়। তথ্যমূলক লেখার মধ্যে ছবি, ছক, সারণি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

কোনো ব্যক্তির জীবনী, স্কুল বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি, বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা-নির্ভর বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে তথ্যমূলক রচনা তৈরি করা যায়। তথ্যমূলক লেখার মূল উদ্দেশ্য পাঠককে তথ্য জানানো। তাই এ ধরনের লেখায় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়। যেমন, তুমি হয়তো বাংলাদেশে মোবাইল ব্যবহারকারীদের নিয়ে একটি তথ্যমূলক রচনা তৈরি করতে চাও। এক্ষেত্রে তোমার মোবাইল আছে কি নেই, মোবাইল ব্যবহার করতে ভালো না মন্দ লাগে, এ রকম কথা লেখার দরকার নেই। বরং বছর অনুযায়ী মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা, কোন ধরনের মোবাইল ব্যবহারকারী কত জন, এগুলো উল্লেখ করা জরুরি।

তথ্যমূলক রচনা লিখি

তোমরা দলে ভাগ হও। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করো। এখানে কয়েকটি নমুনা-প্রশ্ন দেওয়া হলো:

১. স্কুলের আশেপাশে কী কী ফলের গাছ আছে? কোন গাছ কতটি করে আছে?

২. স্কুলের আশেপাশে কী কী ফুলের গাছ আছে? কখন কোন ধরনের ফুল ফোটে?

৩. তোমাদের এলাকায় কোন কোন পাখি বেশি দেখা যায়? কোন পাখির রং কেমন?

৪. তোমার এলাকায় কোন কোন পেশার মানুষ আছে? তারা কী ধরনের কাজ করেন?

৫. স্কুলের আশেপাশে কোন কোন ধরনের দোকান আছে? কোন দোকানে কী কী জিনিস পাওয়া যায়?

একেকটি দল একেকটি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করবে। এরপর এসব তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকে পৃথকভাবে একটি তথ্যমূলক রচনা লিখবে।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্লেষণমূলক লেখা

বিবরণমূলক লেখায় কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনার বিবরণ থাকে। আর তথ্যমূলক লেখায় কোনো বিষয়ের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে বিবরণ ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশ করা হয় যেসব রচনায়, তাকে বিশ্লেষণমূলক লেখা বলে।

নিচে একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা দেওয়া হলো। এটি আনিসুজ্জামানের লেখা। আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২০ সালে মারা যান। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'বিপুলা পৃথিবী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কত কাল ধরে

আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস। হয়তো আরও বেশি সময়ের। এ ইতিহাসের সবটা আজও ভালো করে জানা নেই আমাদের। আলো-আঁধারের খেলায় অনেক পুরানো কথা ঢাকা পড়েছে।

ইতিহাস বলতে শুধু রাজ-রাজড়াদের কথাই বোঝায় না। বোঝায় সব মানুষের কথা। এককালে এদেশে রাজ-রাজড়া ছিল না, তখন মানুষের দাম ছিল বেশি। লোকজন নিজেরাই যুক্তি পরামর্শ করে কাজ করত, চাষ করত, ঘর বাঁধত, দেশ চালাত।

তারপর তেইশ-চব্বিশশ বছর আগে–রাজা এলেন এদেশে। সেই সঙ্গে মন্ত্রী এলেন, সামন্ত-মহাসামন্তের দল এলেন। কত লোক-লস্কর বহাল করা হলো, কত ব্যবস্থা, কত নিয়মকানুন দেখা দিলো।

এক কথায় তখন কারো গর্দান যেত, কেউ বড়োলোক হয়ে যেত কারও খুশির বদৌলতে। তখন থেকে ইতিহাসে বড়ো বড়ো অক্ষরে রাজাদের নাম লেখা হয়ে গেল, আর প্রজারা রইল পেছনে পড়ে।

তবু এদের কথা কিছু কিছু জানা যায়, পরিচয় পাওয়া যায় এদের জীবনযাত্রার।

হাজার বছর আগে সব পুরুষই পরত ধুতি, সব মেয়েই শাড়ি। শুধু সচ্ছল অবস্থা যাদের, তাদের বাড়ির ছেলেরা ধুতির সাথে চাদর পরত, মেয়েরা শাড়ির সাথে ওড়না ব্যবহার করত। এখনকার মতো তখনো মেয়েরা আঁচল টেনে ঘোমটা দিত, শুধু ওড়নাওয়ালিরা ঘোমটা দিত ওড়না টেনে। তবে ধুতি আর শাড়ি দুই-ই হতো বহরে ছোটো। তাতে নানা রকম নকশাও কাটা হতো। মখমলের কাপড় পরত শুধু মেয়েরা। নানা রকম সূক্ষ্ম পাটের ও সুতোর কাপড়ের চল ছিল। জুতো পরতে পেত না সাধারণ লোকে–শুধু যোদ্ধা বা পাহারাদাররা জুতো ব্যবহার করত। সাধারণে পরত কাঠের খড়ম। ছাতা-লাঠির ব্যবহার ছিল।

সাজসজ্জার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল প্রাচীন বাঙালির। চুলের বাহার ছিল দেখবার মতো। বাবরি রাখত ছেলেরা। না হয় মাথার ওপরে চুড়ো করে বাঁধত চুল। এখন মেয়েরা যেমন ফিতে বাঁধে চুলে, তখন শৌখিন পুরুষেরাও অনেকটা তেমনি করে কোঁকড়া চুল কপালের ওপর বেঁধে রাখত। মেয়েরা নিচু করে 'খোঁপা' বাঁধত–নয়তো উঁচু করে বাঁধত 'ঘোড়াচূড়'। কপালে টিপ দিত, পায়ে আলতা, চোখে কাজল আর খোঁপায় ফুল। নানা রকম প্রসাধনীও ব্যবহার করত তারা।

মেয়েরা তো বটেই, ছেলেরাও সে যুগে অলংকার ব্যবহার করত। সোনার অলংকার পরতে পেত শুধু ধনী লোকেরা। তাদের বাড়ির ছেলেরাও সুবর্ণকুণ্ডল পরত, মেয়েরা কানে দিত সোনার 'তারঙ্গ'। হাতে, বাহুতে, গলায়, মাথায় সর্বত্রই সোনা-মণি-মুক্তা শোভা পেত তাদের মেয়েদের। সাধারণ পরিবারের মেয়েরা হাতে পরত শাঁখা, কানে কচি কলাপাতার মাকড়ি, গলায় ফুলের মালা।

ভাত বাঙালির বহুকালের প্রিয় খাদ্য। সরু সাদা চালের গরম ভাতের কদর সব চাইতে বেশি ছিল বলে মনে হয়। পুরোনো সাহিত্যে ভালো খাবারের নমুনা হিসেবে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এই : কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, নালিতা শাক, মৌরলা মাছ আর খানিকটা দুধ। লাউ, বেগুন ইত্যাদি তরিতরকারি প্রচুর খেত সেকালের বাঙালিরা, কিন্তু ডাল তখনো বোধহয় খেতে শুরু করেনি। মাছ তো প্রিয় বস্তুই ছিল–বিশেষ করে ইলিশ মাছ। শুঁটকির চল সেকালেও ছিল–বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে। ছাগমাংস সবাই খেত–হরিণের মাংস বিয়ে বাড়িতে বা এ রকম উৎসবেই সাধারণত দেখা যেত। পাখির মাংসও তাই। ক্ষীর, দই, পায়েস, ছানা–এসব ছিল বাঙালির নিত্য প্রিয়। আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল ছিল প্রিয় ফল। আর খুব চল ছিল খাজা, মোয়া, নাড়ু, পিঠেপুলি, বাতাসা, কদমা এসবের। মশলা দেওয়া পান খেতেও সকলে ভালোবাসত।

সাধারণ লোকে মাটির পাত্রেই রান্নাবান্না করত। 'জালা', 'হাঁড়ি', 'তেলানি'–সচরাচর এসব পাত্রের ব্যবহারই করা হতো।

সেকালের পুরুষেরা ছিল শিকারপ্রিয়। কুস্তি খেলারও চল ছিল বেশ। মেয়েরা সাঁতার দিতে ও বাগান করতে ভালোবাসত। মেয়েরা খেলত কড়ির খেলা–ছেলেরা দাবা আর পাশা। ধনী লোকেরা ঘোড়া আর হাতির খেলা দেখত। যাদের সে ক্ষমতা ছিল না, তারা ভেড়ার লড়াই আর মোরগ-মুরগির লড়াই বাঁধিয়ে দিত। নাচগানের বেশ প্রসার ছিল। বীণা, বাঁশি, কাড়া, ছোটো ডমরু, ঢাক–এসব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল নৌকা। হাতির পিঠে ও ঘোড়া-গাড়িতে চড়ত শুধু অবস্থাপন্ন লোকেরা। গরুর গাড়ি সাধারণ লোকে ব্যবহার করত–তবে সব সময় নয়–বিশেষ উপলক্ষে। মেয়েরা ‘ডুলি’তে চড়ত। পালকির ব্যবহারও ছিল। ধনী লোকদের পালকি হতো খুব সাজানো-গোছানো, রাজবাড়িতে হাতির দাঁতের পালকিও থাকত।

বেশির ভাগ লোকই থাকত কাঠ-খড়-মাটি-বাঁশের বাড়িতে। ধনী লোকেরাই শুধু ইট-কাঠের বাড়ি করত।

ওপরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার বলতে হয়েছে সকলে এক রকম ছিল না। কেননা, সেই পুরনো কাল আর নেই, যখন সবাই মিলে মিশে কাজ করত। রাজা এসে গেছেন সমাজে। তাই কেউ প্রভু, কেউ ভৃত্য। কেউ প্রভুর প্রভু, কেউ দাসের দাস! দুজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির রচনায় তাই এমন দুটি ছবি পাওয়া যায়–সে দুটো ছবি যে একই দেশের, সে কথা মনে হয় না। একজন দিয়েছেন মেয়েদের বর্ণনা: কপালে কাজলের টিপ, হাতে চাঁদের কিরণের মতো সাদা পদ্মবৃন্তের বালা ও তাগা, কানে কচি রিঠা ফলের দুল, স্নানস্নিগ্ধ কেশে তিলপল্লব।

আরেকজন এঁকেছেন সংসারের ছবি: নিরানন্দে তার দেহ শীর্ণ, পরনে ছেঁড়া কাপড়। ক্ষুধায় পেট আর চোখ বসে গেছে শিশুদের, যেন এক মণ চালে তার একশ দিন চলে যায়।

রাজাদের দল এখন আর নেই। মৌর্য-গুপ্ত, পাল-সেন, পাঠান-মুঘল, কোম্পানি-রানি এদের কাল শেষ হয়েছে। আজকের দুই কবিও হয়তো দুই প্রান্তে বসে এমনি করে কবিতা লিখছেন। একজন লিখছেন সমৃদ্ধির কথা, বিলাসের কথা, আনন্দের কথা। আরেকজন ছবি আঁকছেন নিদারুণ অভাবের, জ্বালাময় দারিদ্র্যের, অপরিসীম বেদনার। সরু চালের সাদা গরম ভাতে গাওয়া ঘি–কতকাল ধরে কত মানুষ শুধু তার স্বপ্নই দেখে আসছে।

শব্দের অর্থ

গর্দান যাওয়া: মাথা কাটা।

ঘোড়াচূড়: এক ধরনের খোঁপার নাম।

ডুলি: ছোটো পালকি।

তাগা: বাহুতে পরার অলংকার।

তারঙ্গা: কানে পরার অলংকার।

তিলপল্লব: তিলগাছের কচি পাতা।

নিরানন্দ: আনন্দহীন।

পদ্মবৃন্ত: পদ্ম ফুলের বোঁটা।

বদৌলতে: কারণে।

মাকড়ি: একপ্রকার দুল।

লোক-লস্কর: সশস্ত্র লোক ও তাদের সহযোগী।

শীর্ণ: রোগা।

সামন্ত: জমিদার।

সুবর্ণকুণ্ডল: সোনার দুল।

স্নানস্নিগ্ধ কেশ: ধোয়া চুল।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. এই রচনাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা? ....

....

খ. এই লেখা থেকে কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক বাক্য খুঁজে বের করো। ....

....

....

....

....

গ. বিবরণমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল-অমিল আছে? ....

....

....

....

....

ঘ. তথ্যমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল-অমিল আছে? ....

....

....

....

....

ঙ. এই লেখার উপর তোমার মতামত দাও। ....

....

....

....

....

....

বলি ও লিখি

‘কত কাল ধরে’ রচনায় লেখক যা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

লেখা নিয়ে মতামত

'কত কাল ধরে' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো।

'কত কাল ধরে' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১.	
২.	

তথ্য বিশ্লেষণ

‘কত কাল ধরে’ লেখাটির প্রায় পুরো অংশে লেখক এ অঞ্চলের প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। নারী ও পুরুষ কোন ধরনের পোশাক ও অলংকার পরত, এখানকার মানুষ কোন ধরনের খাবার খেতো, তাদের পছন্দ-অপছন্দের বিষয় কী ছিল, এগুলোর বিবরণ লেখক দিয়েছেন। এই বিবরণ দিতে গিয়ে লেখককে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

ছক বা সারণিতে যেসব সংখ্যা বা বিষয় থাকে, সেগুলোকে বলে উপাত্ত। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায়। নিচের ছকে কিছু উপাত্ত আছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর ভয়াবহ অত্যাচারে বিপুল সংখ্যক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রয় নেওয়া মানুষকে শরণার্থী বলে। তাদের জন্য বহু সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ছকে উপাত্ত হিসেবে আশ্রয়কেন্দ্র ও শরণার্থীর সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের প্রদেশ	আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	শরণার্থীর সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯২	৭২,৩৫,৯১৬ জন
ত্রিপুরা	২৭৬	১৩,৮১,৬৪৯ জন
মেঘালয়	১৭	৬,৬৭,৯৮৬ জন
আসাম	২৮	৩,৪৭,৫৫৫ জন
বিহার	৮	৩৬,৭৩২ জন
মধ্যপ্রদেশ	৩	২,১৯,২৯৮ জন
উত্তর প্রদেশ	১	১০,১৬৯ জন
মোট	৮২৫	৯৮,৯৯,৩০৫ জন

উপরের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণমূলক বাক্য রচনা করা যায়। যেমন, একটি বাক্য: পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শরণার্থী ক্যাম্প ছিল। আবার, আরেকটি বাক্য হতে পারে এমন: উত্তর প্রদেশে ১০ হাজারের কিছু বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল।

এভাবে এই ছকের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আরও কয়েকটি বাক্য রচনা করো।

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৭. ....

৮. ....

৯. ....

১০. ....

উপরে লেখা বিশ্লেষণমূলক বাক্যগুলোর ভিত্তিতে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করো। লেখার শুরুতে একটি শিরোনাম দাও।

____

....

....

....

....

৫ম পরিচ্ছেদ

কল্পনানির্ভর লেখা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৫২ সালে। তিনি কিশোর উপযোগী প্রচুর সংখ্যক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, যেমন: 'দীপু নাম্বার টু' 'আমার বন্ধু রাশেদ' ইত্যাদি। তাঁর লেখা বইয়ের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি; যেমন: 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ', 'ত্রিনিটি রাশিমালা', 'প্রজেক্ট নেবুলা' ইত্যাদি। নিচে তাঁর লেখা একটি গল্প দেওয়া হলো।

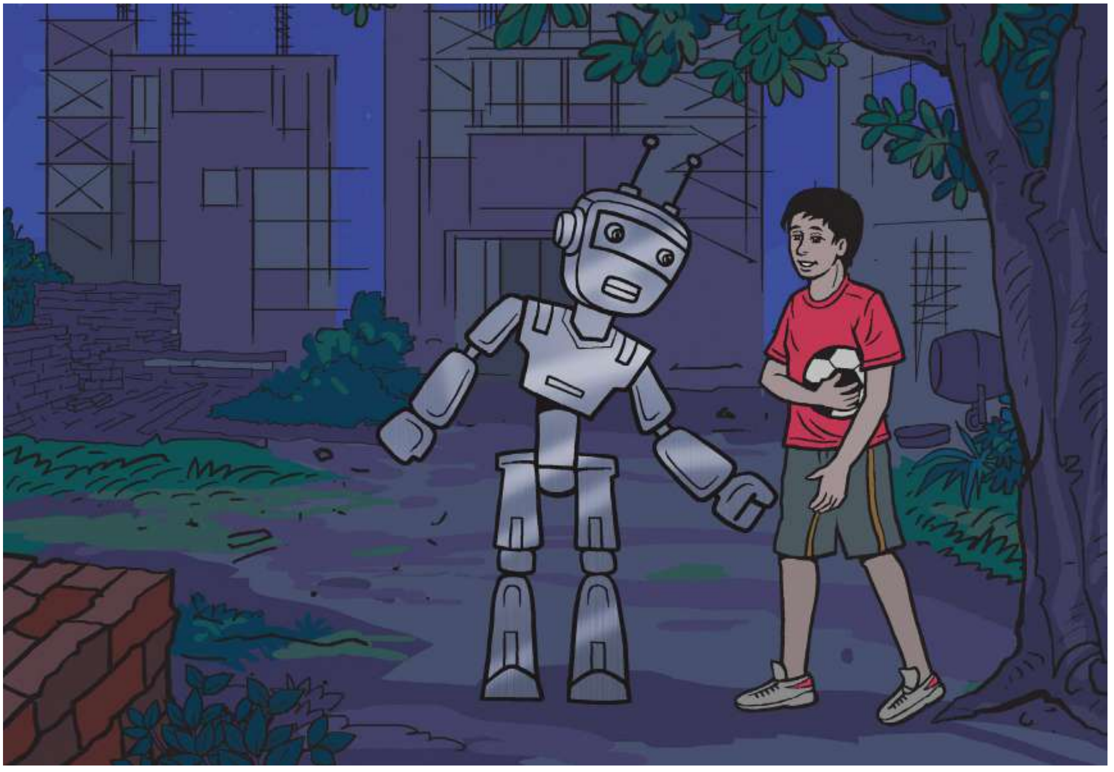

আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে সেই ছেলেবেলা থেকে। রঞ্জুর বয়স তখন চার, তার আব্বা-আম্মা ভাবলেন সে এখন বড়ো হয়ে গেছে, তার আলাদা ঘরে ঘুমানো উচিত। বড়ো বোন শিউলির ঘরে তার জন্যে ছোটো খাট দেওয়া হলো, সেখানে রইল রংচঙে চাদর আর ঝালর দেওয়া বালিশ। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে যেন একা একা না লাগে সেজন্যে মাথার কাছে রইল তার প্রিয় খেলনা ভালুক। গভীর রাতে আম্মা দেখেন রঞ্জু ঘুম থেকে উঠে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? ঘুম থেকে উঠে এলি যে?

রঞ্জু তার আব্বা আর আম্মার মাঝখানে শুতে শুতে বলল, ভালুকটা ঘুমাতে দেয় না।

আম্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, খেলনা ভালুক তোকে ঘুমাতে দেয় না?

না। যখনই ঘুমাতে যাই খামচি দেয়। রঞ্জু শার্টের হাতা গুটিয়ে দেখাল, এই দেখো।

আম্মা দেখলেন আঁচড়ের দাগ। বিকেলবেলা পাশের বাসার ছোটো মেয়েটির পুতুল কেড়ে নিতে গিয়ে খামচি খেয়েছিল, নিজের চোখে দেখেছেন। মাঝরাতে সেটা নিয়ে রঞ্জুর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন না।

পরদিন তার বিছানায় খেলনা ভালুকটা সরিয়ে সেখানে ছোটো একটা কোলবালিশ দেওয়া হলো। কিন্তু আবার মধ্যরাতে দেখা গেল রঞ্জু গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। আম্মাকে ডেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিজের জন্যে জায়গা করতে করতে বলল, খুব দুষ্টুমি করছে।

কে?

ময়ূরটা।

কোন ময়ূর?

ওই যে দেয়ালে।

আম্মার মনে পড়ল সেই ঘরের দেয়ালে শিউলি একটা ময়ূরের ছবির পোস্টার লাগিয়ে রেখেছে, বললেন, সেটা তো ছবি।

রঞ্জু মাথা নাড়ল, ছবি ছিল। রাত্রিবেলা ছবি থেকে বের হয়ে এসে পায়ে ঠোকর দেয়। এই দেখো আমার বুড়ো আঙুলে ঠোকর দিয়েছে।

অন্ধকারে আম্মা রঞ্জুর পায়ের নখ বা ময়ূরের কাজকর্ম দেখার উৎসাহ অনুভব করলেন না। রঞ্জুকে পাশে শোয়ার জায়গা করে দিলেন।

ব্যাপারটা এইভাবে শুরু হয়েছে–প্রয়োজনে রঞ্জু চমৎকার গল্প ফেঁদে বসে। আব্বা বললেন, ছোটো মানুষ সত্যি-মিথ্যে গুলিয়ে ফেলে। বড়ো হলে ঠিক হয়ে যাবে।

যত দিন যেতে থাকল রঞ্জুর বানিয়ে গল্প বলার অভ্যাস আরো বেড়ে যেতে থাকল। বছরখানেক পরে রঞ্জুকে নিয়ে সমস্যা আরো বেড়ে গেল–কারণ তখন হঠাৎ করে সে সায়েন্স ফিকশন পড়া আরম্ভ করেছে। সায়েন্স ফিকশনের উদ্ভট কাহিনি পড়ে তার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেল–আগে বানিয়ে বানিয়ে সে যেসব গল্প বলত সেগুলো তবুও কোনো না কোনোভাবে সহ্য করা যেত। কিন্তু আজকাল যেগুলো বলে সেগুলো আর সহ্য করার মতো নয়।

রঞ্জুর এই গল্প বলা রোগের সবচেয়ে ভুক্তভোগী হচ্ছে তার বড়ো বোন শিউলি। বড়ো বোনেরা সাধারণত নানাভাবে ছোটো ভাইদের উৎপাত করে থাকে, কিন্তু শিউলি মোটেও সেরকম মেয়ে না, সে ধৈর্য ধরে রঞ্জুর গল্প শুনত, গল্পের যেখানে বিস্ময় প্রকাশ করার কথা সেখানে বিস্ময় প্রকাশ করত, যেখানে দুঃখ পাওয়ার কথা সেখানে দুঃখ পেত, যেখানে খুশি হওয়ার কথা সেখানে খুশি হতো। গল্প শুনে সে কখনো বিরক্ত হতো না এবং যত আজগুবিই হোক না কেন সবসময় সে এমন ভান করত যেন সে গল্পটা বিশ্বাস করেছে।

রঞ্জুর সায়েন্স ফিকশনের প্রতি বাড়াবাড়ি প্রীতি জন্ম নেবার পর শিউলির জন্যেও গল্পগুলো হজম করা কঠিন হয়ে পড়তে শুরু করল। প্রায় প্রতিদিনই রঞ্জু এসে মহাকাশের কোনো এক আগন্তুকের কথা বলতে লাগল। কোনদিন সেই আগন্তুক তাকে ব্ল্যাকহোলের গোপন রহস্যের কথা বলে গেছে, তার কাছে কাগজ কলম ছিল না বলে লিখে রাখতে পারেনি, লিখে রাখতে পারলেই পৃথিবীতে হইচই শুরু হয়ে যেত। কোনদিন একটা ফ্লাইং সসার থেকে বিদঘুটে কোন প্রাণী লেজারগান দিয়ে তাকে গুলি করতে চেষ্টা করেছে আর সে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে, আবার কোনদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একটা জারুল গাছের নিচে চতুষ্কোণ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে সেখানে উঁকি মারতেই ভিন্ন একটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক ঝলক দৃশ্য দেখে এসেছে।

একদিন রঞ্জু এসে শিউলিকে খুব উত্তেজিত গলায় বলল, আপু, যা একটা কাণ্ড হয়েছে!

শিউলি চোখেমুখে যথেষ্ট আগ্রহ ফুটিয়ে বলল, কী হয়েছে?

ফুটবল খেলে ফিরে আসছি, দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে নূতন যে বিল্ডিংগুলো তৈরি হচ্ছে তার ভিতর দিয়ে শর্টকাট মারছি। মাঝামাঝি জায়গাটায় যেখানে ইটগুলো সাজিয়ে রেখেছে সেখানে আসতেই হঠাৎ একটা রোবট বের হয়ে এল।

শিউলি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, রোবট?

হ্যাঁ। চকচকে স্টেনলেসের শরীর। মাথার দুই পাশ থেকে আলো বের হচ্ছে, চোখগুলো সবুজ। আমাকে দেখে হাত তুলে নাকি স্বরে বলল, এ-ই-ছে-লে-কো-থা-য়-যা-ও?

শিউলি হাসি গোপন করে বলল, তাই নাকি? আমি জানতাম শুধু পেতনিরা নাকি স্বরে কথা বলে, রোবটরাও তাহলে নাকি স্বরে কথা বলে?

রঞ্জু মাথা নেড়ে বলল, তাই তো দেখলাম। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, বাসায় যাই।

রোবটটা বলল, তু-মি-কি-আ-মা-র-এ-ক-টা-উ-প-কা-র-ক-র-তে-পা-র-বে?

আমি বললাম, কী উপকার? তখন সেটা বলল তার নাকি ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি তো অবাক! রোবটের আবার খিদে পায় নাকি? তখন রোবটটা আমাকে বলল তাদের যখন খিদে পায় তখন তাদের ব্যাটারি খেতে হয়। মোটা মোটা ডি সাইজের ব্যাটারি।

শিউলি বিস্ময়ের ভান করে বলল, তাই নাকি?

রঞ্জু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

তুই ব্যাটারি কিনে দিলি?

হ্যাঁ–দোকান থেকে দুই ডজন ব্যাটারি কিনে দিয়ে এলাম, আর আমার সামনে কচ কচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

ব্যাটারি কেনার পয়সা পেলি কই?

রোবটটাই দিলো, তার কাছে সব দেশের টাকা আছে।

শিউলি হাসি গোপন করে বলল, তুই যে রোবটের এত বড়ো উপকার করলি, সে তোকে কিছু উপহার দিলো না?

রঞ্জু মনমরা হয়ে বলল, দিয়েছে।

কী দিয়েছে?

রঞ্জু পকেট থেকে কয়েকটা তেঁতুলের বিচি বের করে বলল, এইগুলো।

তেঁতুলের বিচি?

এগুলো দেখলে মনে হয় সাধারণ তেঁতুলের বিচি, আসলে এর থেকে যে গাছ বের হয় সেটা থেকে ক্যানসারের ওষুধ বের করা যাবে।

শিউলি গম্ভীর গলায় বলল, তাহলে এগুলো যত্ন করে রাখিস, আবার হারিয়ে না যায়।

হ্যাঁ, রাখব।

রঞ্জু তখন তেঁতুলের বিচি খুলে তার ছোটো বাক্সটার মাঝে গুছিয়ে রাখল।

এর কয়দিন পরের কথা। আম্মা নানাকে একটা চিঠি লিখছেন। পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ যখন বলপয়েন্ট কলম দিয়ে লিখছে তখন আম্মা কোন একটা বিচিত্র কারণে ফাউনটেন পেন ছাড়া লিখতে চান না। চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ আম্মার ফাউনটেন পেনে কালি শেষ হয়ে গেল। আম্মা রঞ্জুকে ডেকে বললেন, কালির দোয়াতটা নিয়ে আয় তো।

রঞ্জু দোয়াতটা নিয়ে আসছিল আর ঠিক তখন কোনো কারণ নেই, কিছু নেই হঠাৎ করে সে হোঁচট খেল, সাথে সাথে হাত থেকে কালির দোয়াত ছিটকে গেল উপরে, তারপর আছড়ে পড়ল নিচে–আর কিছু বোঝার আগে দোয়াত ভেঙে একশ টুকরা হয়ে মেঝেতে কার্পেটে কালি ছড়িয়ে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা হলো।

আম্মা তখন এমন রেগে গেলেন যে, সে আর বলার মতো নয়। রঞ্জুকে বকতে বকতে আম্মা তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়লেন–এমন এমন কথা বলতে লাগলেন যে রঞ্জুর মনে হতে লাগল যে বেঁচে থাকার বুঝি কোনো অর্থই হয় না। খানিকক্ষণ সে ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদল, তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল।

নির্জন ছাদ, পাশে কয়েকটা নারকেল গাছ, বাতাসে তাদের পাতা ঝিরঝির করে নড়ছে। আকাশের মাঝামাঝি অর্ধেকটা চাঁদ, তাতেই চারদিকে আলো হয়ে আছে। ছাদে এসে রঞ্জুর মনটা একটু শান্ত হলো। এ রকম সময় রঞ্জুর মনে হলো পেছনে কেমন জানি এক ধরনের শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। একটু অবাক হয়ে পেছন ঘুরে সে যেটা দেখল তাতে তার সমস্ত শরীর শীতল হয়ে গেল, গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দেবে দেবে করেও সে অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল।

রঞ্জু দেখল তার পেছনে দুই মানুষ সমান উঁচু জায়গাতে গোলমতোন একটা মহাকাশযান ভাসছে। সেটি বিরাট বড়ো, প্রায় পুরো ছাদ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে–ঠিক নিচে একটা গোল গর্তের মতোন, সেখান থেকে নীল আলো বেরিয়ে আসছে। মহাকাশযানটি প্রায় নিঃশব্দ, শুধু হালকা একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ, খুব কান পেতে থাকলে শোনা যায়।

রঞ্জু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। প্রথমে মনে হলো সে বোধহয় পাগল হয়ে গেছে–পুরোটা একটা দৃষ্টিবিভ্রম, কিন্তু ভালো করে তাকাল সে, বুঝতে পারল এটা দৃষ্টিবিভ্রম নয়, সত্যি সত্যি দেখছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে মুখ হা করে তাকিয়ে রইল।

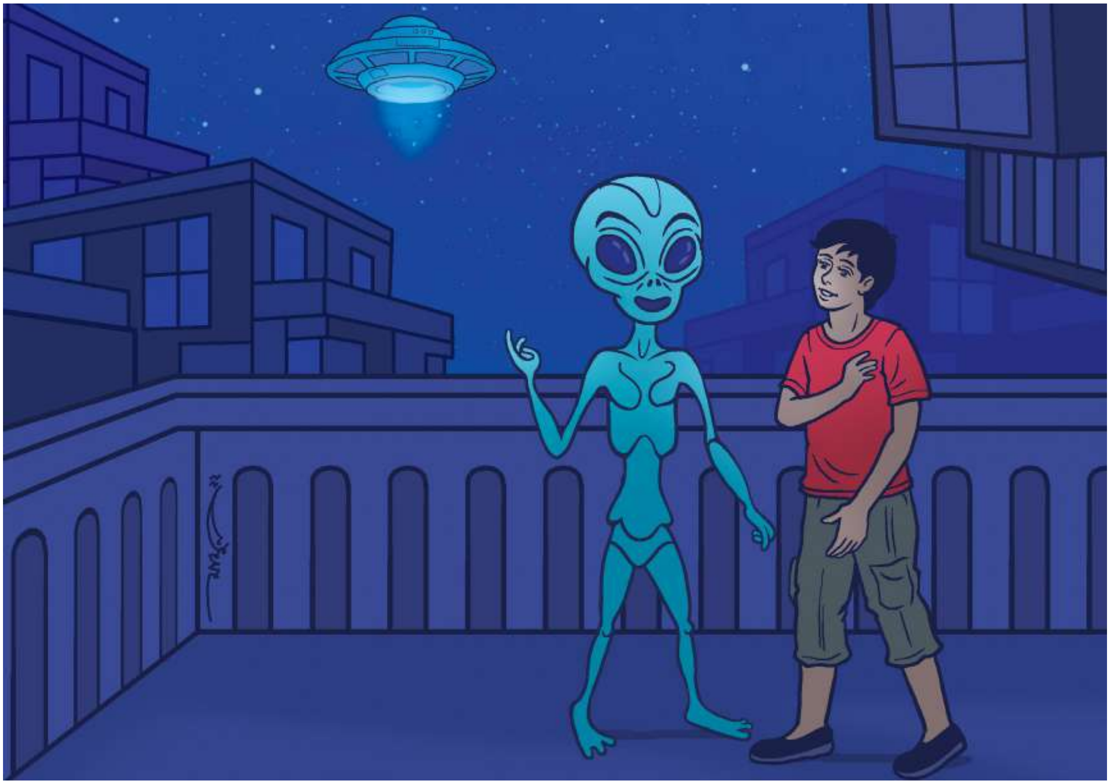

একটু পরে নীল আলোতে হঠাৎ একটা আবছা ছায়া দেখতে পায়, ছায়াটা কিলবিল করে নড়তে থাকে, তারপর হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়, মনে হতে থাকে অনেক দিন না খেয়ে একটা মানুষ শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে–শুধু মাথাটা না শুকিয়ে আরো বড়ো হয়ে গেছে, সেখানে গোল গোল চোখ, নাক নেই, সেখানে দুটি গর্ত। মুখের জায়গায় গোল একটা ফুটো দেখে মনে হয় বুঝি খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

প্রাণীটি কিলবিল করতে করতে একটা শব্দ করল। শব্দটি অদ্ভুত। শুনে মনে হয় একজন মানুষ হাঁচি দিতে গিয়ে থেমে গিয়ে কেশে ফেলেছে। রঞ্জু কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, ওয়েলকাম জেন্টলম্যান।

কেন জানি তার ধারণা হলো ইংরেজিতে কথা বললে সেটা এই প্রাণী ভালো বুঝতে পারবে। প্রাণীটা তখন হঠাৎ করে পরিষ্কার বাংলায় বলল, শুভসন্ধ্যা মানবশিশু।

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, তুমি বাঙালি?

প্রাণীটা বলল, না, আমি বাঙালি নই। তবে আমি তোমার গ্রহের যে কোনো মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারি। এই দেখো– বলে প্রাণীটা পরিষ্কার চাটগাঁয়ের ভাষায় বলল, ‘আঁসার বজা কুড়ার বজা ফত্যি আডত বেচি, বাজার গরি বাড়িত আইলে ইসাব লয় তোঁর চাচি’। ফ্লাইং সসার এবং তার রহস্যময় প্রাণী দেখে রঞ্জু যত অবাক হয়েছিল, তার মুখে চাটগাঁয়ের কথা শুনে সে তার থেকে বেশি অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সাথে সাথে আরো একটা ব্যাপার ঘটল, তার ভেতর থেকে ভয়টা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। সে খুক খুক করে একটু হেসে ফেলে বলল, তোমার নাম কী?

তোমাদের মতো আমাদের নামের প্রয়োজন হয় না। আমরা এমনিতেই পরিচয় রাখতে পারি।

রঞ্জু বলল, আমার নাম রঞ্জু। তোমাকে দেখে আমার খুব মজা লাগছে।

কেন?

আমার তো সায়েন্স ফিকশন পড়তে খুব ভালো লাগে–তাই।

প্রাণীটা কাশির মতো একটা শব্দ করে বলল, সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে গাঁজাখুরি।

তু–তুমি সায়েন্স ফিকশন পড় না?

আমাদের কিছু পড়তে হয় না। আমরা এমনিতেই সব জানি।

সত্যি?

সত্যি। আমরা তোমার কাছে এসেছি একটা কারণে। আমাদের এক্ষুনি ক্র্যাব নেবুলাতে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের ফুয়েল ট্যাংকে একটা লিক হয়েছে, সেটা সারানোর সময় নেই। তুমি সেজন্যে আমাদের সাহায্য করবে।

রঞ্জু অবাক হয়ে বলল, আমি?

হ্যাঁ তুমি।

কীভাবে?

তোমার বাম পকেটে একটা চুইংগাম আছে। সেটা চিবিয়ে নরম করে দাও, আমাদের ট্যাংকের লিকটাতে সেটা লাগিয়ে নেব।

রঞ্জু অবাক হয়ে গেল, সত্যি সত্যি তার পকেটে চুইংগামের একটা স্টিক আছে। সেটা মুখে পুরে চিবিয়ে নরম করে মুখ থেকে বের করে প্রাণীটার দিকে এগিয়ে দেয়। প্রাণীটা বলল, আরও কাছে আসো। আমি এই নীল শক্তি বলয় থেকে বের হতে পারব না।

রঞ্জু আরেকটু এগিয়ে গেল। প্রাণীটা তখন তার তুলতুলে নরম হাত দিয়ে চুইংগামটা নিয়ে বলল, অনেক ধন্যবাদ।

রঞ্জু বলল, এখন তোমরা যাবে?

হ্যাঁ। তুমি আমাদের সাহায্য করেছ বলে আমরা তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই।

রঞ্জু কাঁপা গলায় বলল, কী উপহার?

আমরা যেখানে থাকি, সেই ক্র্যাব নেবুলার একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি আছে। তোমাদের গ্রহতেই পেয়েছি, আমরা অনেকগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বাসস্থানে। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি একটা। হাত বাড়াও–

উত্তেজনায় রঞ্জুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হলো। সে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সেখানে গোলমতোন একটা জিনিস এসে পড়ল।

প্রায় সাথে সাথেই নীল আলোটা ভেতরে ঢুকে যায় আর ফ্লাইং সসারের মতো জিনিসটা ঘুরপাক খেতে খেতে উপরে উঠে যেতে থাকে। রঞ্জু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল সেটা ছোটো হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

গোলাকার জিনিসটা হাতে নিয়ে সে সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। সিঁড়ির আলোতে জিনিসটা ভালো করে দেখল এবং সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল সেটা একটা আমড়া। সাথে সাথে তার মনে পড়ল আমড়ার আঁটিটা আসলে সত্যিই ক্র্যাব নেবুলার মতো দেখতে। মহাকাশের এক বিচিত্র প্রাণী তার সাথে এ রকম ফাজলামি করবে কে জানত!

রঞ্জু হতচকিতের মতো নিজের ঘরে এসে ঢুকল, শিউলি তাকে দেখে এগিয়ে আসে, কী রে রঞ্জু তুই কোথায় ছিলি, খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

রঞ্জু নিচু গলায় বলল, ছাদে।

ছাদে একা একা কী করছিলি?

রঞ্জু খানিকক্ষণ শিউলির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, কিছু না।

কিছু না?

না।

শিউলি একটু অবাক হয়ে রঞ্জুর দিকে ঘুরে তাকাল, তাকে ভালো করে দেখল, তারপর জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে? এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন?

কী রকম করে?

মনে হচ্ছে তুই ভূতটুত কিছু একটা দেখে এসেছিস!

রঞ্জু কিছু বলল না। শিউলি আবার জিজ্ঞেস করল, তোর হাতে ওটা কী?

আমড়া।

আমড়া! শিউলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার জন্যে এনেছিস?

রঞ্জু দুর্বলভাবে হেসে বলল, তুমি নেবে?

দে– শিউলি রঞ্জুর হাত থেকে আমড়া নিয়ে ওড়না দিয়ে মুছে একটা কামড় দিয়ে বলল, উহ্! কী টক! কোথায় পেলি এই আমড়া?

রঞ্জু কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কোথায় আবার পাব? সবাই যেখানে পায় সেখানেই পেয়েছি!

(সংক্ষেপিত)

শব্দের অর্থ

আগন্তুক: হঠাৎ চলে আসা ব্যক্তি।

উদ্ভট: আজগুবি।

ওয়েলকাম জেন্টেলম্যান: ভদ্রমহোদয়গণ, স্বাগত জানাই।

কচ কচ: কোনো কিছু চিবানোর শব্দ।

কার্পেট: মেঝেতে পাতা হয় এমন পুরু চাদর।

কিলবিল করে নড়া: স্থির না থেকে আঁকাবাঁকা হয়ে নড়া।

ক্যানসার: একটি রোগের নাম।

ক্র্যাব নেবুলা: মহাকাশের একটি নীহারিকা।

খুক খুক করে হাসা: মৃদু শব্দে হাসা।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা: জোরে চিৎকার করা।

গাঁজাখুরি: অবিশ্বাস্য।

গুটি গুটি পায়ে: ধীরে ধীরে পা ফেলে।

চুইংগামের স্টিক: চুইংগামের পাতলা টুকরা।

ঝালর: নকশা-করা বাড়তি অংশ।

ঝিরঝির: মৃদু আওয়াজ।

ডি সাইজের ব্যাটারি: বড়ো আকারের ব্যাটারি।

ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে এমন ছবি।

দৃষ্টি বিভ্রম: চোখের ভুল।

দোয়াত: কালির পাত্র।

নাকিস্বর: নাক দিয়ে উচ্চারিত শব্দ।

নির্জন: জনশূন্য।

ফাউনটেন পেন: যে কলমে তরল কালি ব্যবহার করা হয়।

ফুয়েল ট্যাংক: যে পাত্রে জ্বালানি তেল থাকে।

ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদা: চাপা গলায় কাঁদা।

বলপয়েন্ট কলম: যে কলমের মাথায় সূক্ষ্ম বল থাকে।

বারোটা বাজানো: অবস্থা খুব খারাপ করে দেওয়া।

বিতিকিচ্ছি অবস্থা: খারাপ অবস্থা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড: মহাবিশ্ব।

ব্ল্যাক হোল: কৃষ্ণ গহ্বর; মহাশূন্যে নক্ষত্রের একটি অন্তিম অবস্থা।

ভান করা: ভাব ধরা।

ভুক্তভোগী: ভুগেছে এমন।

মনমরা হওয়া: মন খারাপ করা।

মহাকাশযান: মহাকাশে চলাচলের উপযোগী যান।

মাথা বিগড়ে যাওয়া: চিন্তা এলোমেলো হওয়া।

লেজার গান: যে বন্দুক থেকে গুলির বিকল্প হিসেবে এক ধরনের আলোকরশ্মি বের হয়।

শক্তি বলয়: নিয়ন্ত্রণে থাকা বৃত্তাকার অঞ্চল।

শরীর শীতল হওয়া: ভয় পেয়ে যাওয়া।

শর্টকাট মারা: সংক্ষেপে কাজ সারা।

শোঁ শোঁ: দ্রুত ছুটে চলার শব্দ।

সায়েন্স ফিকশন: বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।

স্টেনলেস: মরিচা পড়ে না এমন চকচকে লোহা।

হজম করা: গ্রহণ করতে পারা।

হতচকিত: হতভম্ব।

পড়ে কী বুঝলাম

ক. 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' বলতে কী বোঝ? ....

....

....

খ. আগে আর কোন ধরনের কল্পকাহিনি তুমি পড়েছ? ....

....

....

গ. 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' গল্পের কোন কোন ঘটনা কাল্পনিক? ....

....

....

....

....

....

ঘ. এই গল্পের কোন কোন ঘটনা বাস্তব? ....

....

....

....

....

ঙ. রূপকথার সাথে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মিল-অমিল কোথায়? ....

....

....

....

....

বলি ও লিখি

‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

....

....

....

....

....

লেখা নিয়ে মতামত

'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' রচনাটির যেসব বক্তব্য নিয়ে তোমার মতামত রয়েছে, বা মনে প্রশ্ন জেগেছে, তা নিচের ছকে লেখো।

'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' রচনায় যা আছে	আমার মতামত ও জিজ্ঞাসা
১.	
২.	
৩.	
৪.	

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি

চারপাশের যে জগৎ আমরা দেখতে পাই, তাকে বলে বাস্তব জগৎ। অনেক গল্পে বাস্তব জীবনের ঘটনার বর্ণনা থাকে। আবার এমন কিছু গল্প আছে যেগুলো বাস্তবের ঘটনার সাথে মেলে না। এগুলোকে কাল্পনিক গল্প বা কল্পকাহিনি বলে। তার মানে, বাস্তব জগতে বাস করেও গল্পকাররা কল্পনার জগৎ তৈরি করতে পারেন। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখা এমন কাল্পনিক গল্পকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বলে। এসব কাহিনিতে থাকে মহাকাশের কাল্পনিক প্রাণী, তাদের যাতায়াতের জন্য ফ্লাইং সসার, মানুষের মতো আচরণকারী রোবট ইত্যাদি। তাছাড়া এমন কিছু বিষয় থাকে যা বিজ্ঞান হয়তো এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি, কিন্তু লেখকরা সেই বিষয়কেও গল্পে নিয়ে আসেন।

রূপকথাও এক ধরনের কল্পনানির্ভর লেখা। তবে এর সাথে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলও আছে। রূপকথার ঘটনা ও চরিত্র অতীতের–আধুনিক প্রযুক্তি আসার আগেকার। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির বিষয় ও চরিত্র সময়ের বিচারে আধুনিক–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরতায় এর জন্ম। রূপকথায় যে রাজপুত্র-রাজকন্যা বা দৈত্য-ডাইনি তুমি দেখতে পাও, বাস্তবের পৃথিবীতে তাদের দেখা যায় না। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে মহাকাশের কাল্পনিক প্রাণী কিংবা রোবট নিয়ে যেসব গল্প তৈরি হয়েছে, তার কিছু কিছু ভবিষ্যতে সত্যি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কল্পনানির্ভর রচনা লিখি

এবার তুমি একটি কল্পনানির্ভর গল্প লেখো। লেখাটি তুমি বানিয়ে লিখতে পারো, কিংবা সেটি তোমার আগে থেকে পড়া বা কারো কাছ থেকে শোনা গল্পও হতে পারে। লেখার শুরুতে একটি শিরোনাম দাও।

____

....

....

....

....

....

....

....

....

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্য পড়ি লিখতে শিখি

১ম পরিচ্ছেদ

কবিতা

কবিতা পড়ি ১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'গোরা', 'অচলায়তন', 'কালান্তর' তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটি তাঁর রচিত। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতাটি তাঁর 'শিশু' কাব্য থেকে নেওয়া।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

মাঝি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে–
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার ’পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখী যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর;
মানিকজোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।

সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে–
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এপার ওপার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলেমেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে–
আসব তখন চলে
'বড়ো খিদে পেয়েছে গো–
খেতে দাও মা' বলে।
আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শব্দের অর্থ

আঁধার: অন্ধকার।

কাদাখোঁচা: পাখির নাম।

কাশ: তৃণজাতীয় গাছ।

খেয়াঘাট: নৌকা পারাপারের ঘাট।

চখাচখী: এক জোড়া চক্রবাক পাখি; চখা ও চখী।

জলা: জলমগ্ন ভূমি।

জাল টেনে নেওয়া: জাল দিয়ে মাছ ধরা।

ঝাঁকে ঝাঁকে: দলে দলে।

ঝাউডাঙা: যে ডাঙায় ঝাউগাছ আছে।

ডিঙি নৌকা: এক ধরনের নৌকা।

তারি ধারে: তারই পাশে।

ধারে ধারে: কাছাকাছি।

পাঁক: কাদা।

পায়ের চিহ্ন: পায়ের দাগ।

পার: তীর।

বাঁশের খোঁটা: বাঁশের ছোটো খুঁটি।

বিদেশ: দূরে কোথাও।

মানিকজোড়: পাখির নাম।

রাতদুপর: রাত দুপুর; গভীর রাত।

শর: নলখাগড়া গাছ।

সারে সারে: সারিবদ্ধভাবে।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। এই কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘মাঝি’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'মাঝি' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

মিল-শব্দ খুঁজি

ছড়া-কবিতায় এক লাইনের শেষ শব্দের সাথে পরের লাইনের শেষ শব্দের মিল থাকে। যেমন: পারে–ধারে–সারে, রাজি–মাঝি ইত্যাদি। তোমরাও এভাবে মিল-শব্দ তৈরি করতে পারো। নিচে কিছু শব্দ দেওয়া হলো। এগুলোর এক বা একাধিক মিল-শব্দ লেখো।

শব্দ	মিল-শব্দ
১. ছেলে	
২. মেয়ে	
৩. ঘর	
৪. যত	
৫. তখন	
৬. পার	
৭. আঁধার	
৮. জাল	
৯. বাঁশ	
১০. জলা	
১১. দিন	
১২. আসে	

এভাবে যে কোনো শব্দের মিল-শব্দ তৈরি করা যায়। তোমরা এবার জোড়ায় জোড়ায় মিল-শব্দের খেলা খেলতে পারো। একজন উপরের বারোটি শব্দের বাইরে যে কোনো একটি শব্দ বলবে; অন্যজন সেটির মিল-শব্দ বানাবে।

কবিতা পড়ি ২

বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ময়নামতীর চর', 'কুঁচবরণ কন্যা', 'শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালা' ইত্যাদি। কবিতায় পল্লি-প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। নিচের কবিতাটি তাঁর 'ময়নামতীর চর' নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

ময়নামতীর চর

বন্দে আলী মিয়া

এ-পারের এই বুনো ঝাউ আর ও-পারের বুড়ো বট
মাঝখানে তার আগাছায় ভরা শুকনো গাঙের তট;
এরি উঁচু পারে নিত্য বিহানে লাঙল দিয়েছে চাষি,
কুমিরেরা সেথা পোহাইছে রোদ শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি।
কূলে কূলে চলে খরশুলা মাছ, দাঁড়িকানা পালে পালে
ছোঁ দিয়ে তার একটারে ধরি গাঙচিল বসে ডালে
ঠোঁট চেপে ধরি আছাড়ি আছাড়ি নিস্তেজ করি তায়
মুড়ো পেটি লেজ ছিঁড়ি একে একে গিলিয়া গিলিয়া খায়।

এরি কিছু দূরে একপাল গোরু বিচরিছে হেথা সেথা
শিঙে মাটি মাখা দড়ি ছিঁড়ি ষাঁড় চলে সে স্বাধীনচেতা।
মাথা নিচু করি কেহ বা ঝিমায় কেহ বা খেতেছে ঘাস,
শুয়ে শুয়ে কেহ জাবর কটিয়া ছাড়িতেছে নিশ্বাস;
গোচর পাখিরা ইহাদের গায়ে নির্ভয়ে চলে ফেরে
উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে;
বক পাখিগুলো গোচর পাখির হয়েছে অংশীদার
শালিক কেবলই করিছে ঝগড়া কাজ কিছু নাই তার।

নতুন চরের পলি জমিটাতে কলাই বুনেছে যারা
আখের খামারে দিতেছে তারাই রাতভর পাহারা;
খেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে পুঁতে শূন্যে বেঁধেছে ঘর
বিচালি বিছায়ে রচেছে শয্যা বাঁশের বাঁখারি পর।
এমন শীতেও মাঝ মাঠে তারা খড়ের মশাল জ্বালি
ঠকঠকি নেড়ে করিছে শব্দ হাতে বাজাইছে তালি।
ওপার হইতে পদ্মা সাঁতারি বন্য বরাহ পাল
এ-পারে আসিয়া আখ খায় রোজ ভেঙে করে পয়মাল।

শব্দের অর্থ

আছাড়ি আছাড়ি: বারে বারে আছাড় দেওয়া।

আঠালু: গবাদি পশুর গায়ে এঁটে থাকা পরজীবী কীট।

কলাই: মটর ডাল।

খড়ের মশাল: অনেকক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা খড়ের পুটুলি।

খরশুলা মাছ: জলের উপর চোখ ভাসিয়ে চলে এমন মাছ।

গাঙের তট: নদীর তীর।

গোচর পাখি: গোরু যেখানে চরে, সেখানে ঘুরে বেড়ানো পাখি।

জাবর কাটা: চিবিয়ে গিলে খাওয়া খাবার পুনরায় মুখের মধ্যে এনে চিবানো।

ঠকঠকি: চকমকি পাথর।

দাঁড়িকানা: ডানকানা মাছ।

নিত্য বিহানে: রোজ সকালে।

পয়মাল: ধ্বংস।

পেটি: মাছের পেট দিককার অংশ।

বরাহ: শূকর।

বাঁখারি: বাঁশের চাটাই।

বিচরিছে: বিচরণ করছে।

বিচালি: খড়।

মুড়ো: মাছের মাথা।

রোদ পোহানো: গায়ে রোদ লাগানো।

হেথা সেথা: এখানে সেখানে।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘ময়নামতীর চর’ কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘ময়নামতীর চর’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'ময়নামতীর চর' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

কবিতায় শব্দের পরিবর্তন

কবিতায় অনেক সময়ে শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়। ছন্দ মেলাতে গিয়ে কবিরা সাধারণত এটি করে থাকেন। 'ময়নামতীর চর' কবিতা থেকে এমন কিছু শব্দের তালিকা দেওয়া হলো:

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
বিহানে	সকালে
ধরি	ধরে
আছাড়ি	আছাড় মেরে
তায়	সেটাকে
ছিঁড়ি	ছিঁড়ে
বিচরিছে	বিচরণ করছে
হেথা সেথা	এখানে সেখানে
কেহ	কেউ
খেতেছে	খাচ্ছে
ঠোকরিয়া	ঠোকর মেরে
রচেছে	রচনা করেছে
পর	উপর

কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর

কবিতায় যে বর্ণনা থাকে, তাকে গদ্যে রূপান্তর করা যায়। 'ময়নামতীর চর' কবিতা থেকে এ রকম একটি বিবরণ তৈরি করা হলো:

নদীর এক পারে বুনো ঝাউগাছ রয়েছে। অন্য পারে রয়েছে বুড়ো একটা বটগাছ। তার মাঝখানে রয়েছে আগাছায় ভরা নদীর চর। চরের উঁচু দিকে প্রতিদিন সকালে চাষি লাঙল চালায়। চরের এক পাশে কুমির রোদ পোহায়। নদীর কূল ঘেঁষে খরশুলা ও দাঁড়িকানা মাছ দল বেঁধে চলে। গাঙচিল ছোঁ দিয়ে মাছ ধরে ডালে এসে বসে। তারপর ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে মাছটিকে আছাড় মেরে নিস্তেজ করে এবং মাছটির মাথা-পেট-লেজ একে একে ছিঁড়ে গিলে খায়।

কিছু দূরে একপাল গরু চরে বেড়ায়। একটা ষাঁড় দড়ি ছিঁড়ে এদিক ওদিক ছুটে চলে, যার শিঙে মাটি মাখা। কোনো কোনো গোরু মাথা নিচু করে করে ঝিমায়, কেউ ঘাস খায়, কেউ শুয়ে শুয়ে জাবর কাটে। কিছু পাখি গোরুর গায়ে লেগে থাকা উকুন ও আঠালু ঠুকরে ঠুকরে খায়। বক পাখিরাও এদের সঙ্গী হয়। আর শালিক পাখি শুধু কিচির মিচির করে।

নতুন চরের পলি মাটিতে কৃষকেরা কলাই বুনেছে। তারা এখন সারা রাত ধরে আখের খেতে পাহারা দেয়। কৃষকেরা খেতের কোনায় বাঁশ পুতে তার উপরে ঘর বেঁধেছে। বাঁশের চাটাইয়ের উপর বিচালি বিছিয়ে পাতা হয়েছে বিছানা। শীতের মধ্যেও তারা মাঠের মাঝখানে খড়ের আগুন জ্বালায়, ঠকঠকি নেড়ে শব্দ করে আর হাতে তালি বাজায়। পদ্মা নদীর ওপার থেকে বুনো শূকর নদীর এপারে এসে রোজ আখ খায়, আখের খেত নষ্ট করে।

কবিতা পড়ি ৩

আল মাহমুদ বাংলাদেশের প্রধান কবিদের একজন। তিনি ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের মধ্যে আছে ‘লোক লোকান্তর’, ‘কালের কলস’, ‘সোনালি কাবিন’ ইত্যাদি। নিচের ‘নোলক’ কবিতাটি কবির ‘পাখির কাছে ফুলের কাছে’ নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

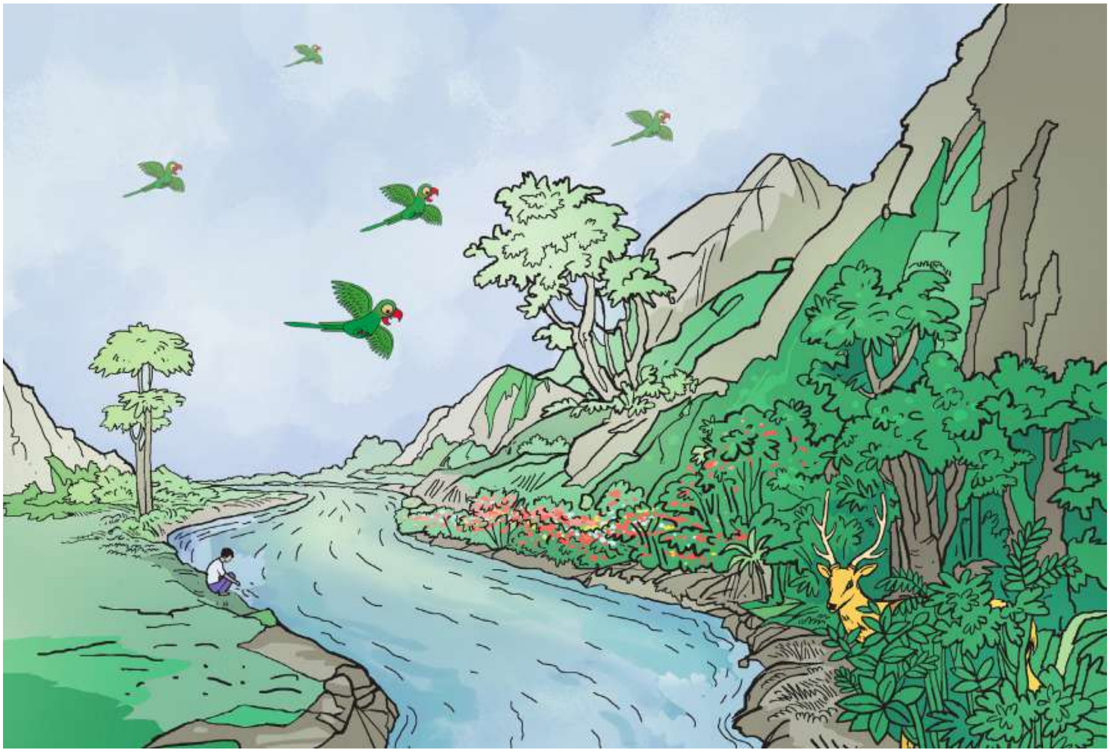

নোলক

আল মাহমুদ

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে?
–হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বলল কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।

জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাব তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো!
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো-
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক।
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাব না।

শব্দের অর্থ

আহার ভরা বুক: শস্যে পরিপূর্ণ স্থান।

এলিয়ে খোঁপা: খোঁপা খুলে।

ঘরকে: ঘরে।

জল ছাড়িয়ে: নদী অতিক্রম করে।

নোলক: নাকে পরার অলংকার।

পাখ ছড়িয়ে: পাখা মেলে।

পাখপাখালি: নানা জাতের পাখি।

পিন্দেছি: পরেছি।

বকরা: বকগুলো।

মিনতি: কাতর প্রার্থনা।

হরিণবেড়ের বাঁক: নদীর কোনো বাঁকের নাম।

হরিৎ টিয়ে: সবুজ রঙের টিয়ে।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। 'নোলক' কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘নোলক’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'নোলক' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

তালে তালে পড়ি

'নোলক' কবিতাটি সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়ো। যেখানে যেখানে তালি পড়ছে, সেখানে সেখানে বাঁকা দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। পড়ার সময়ে বিষয়টি খেয়াল করো।

/আমার মায়ের /সোনার নোলক /হারিয়ে গেল /শেষে

/হেথায় খুঁজি /হোথায় খুঁজি /সারা বাংলা/দেশে।

/নদীর কাছে /গিয়েছিলাম, /আছে তোমার /কাছে?

/–হাত দিও না /আমার শরীর /ভরা বোয়াল /মাছে।

/বলল কেঁদে /তিতাস নদী /হরিণবেড়ের /বাঁকে

/শাদা পালক /বকরা যেথায় /পাখ ছড়িয়ে /থাকে।

/জল ছাড়িয়ে /দল হারিয়ে /গেলাম বনের /দিক

/সবুজ বনের /হরিৎ টিয়ে /করে রে ঝিক/মিক

/বনের কাছে /এই মিনতি, /ফিরিয়ে দেবে /ভাই,

/আমার মায়ের /গয়না নিয়ে /ঘরকে যেতে /চাই।

/কোথায় পাব /তোমার মায়ের /হারিয়ে যাওয়া /ধন

/আমরা তো সব /পাখপাখালি /বনের সাধা/রণ।

/সবুজ চুলে /ফুল পিন্দেছি /নোলক পরি /না তো!

/ফুলের গন্ধ /চাও যদি নাও, /হাত পাতো হাত /পাতো–

/বলে পাহাড় /দেখায় তাহার /আহার ভরা /বুক।

/হাজার হরিণ /পাতার ফাঁকে /বাঁকিয়ে রাখে /মুখ।

/এলিয়ে খোঁপা /রাত্রি এলেন, /ফের বাড়ালাম /পা

/আমার মায়ের /গয়না ছাড়া /ঘরকে যাব /না।

কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

কবিতার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

কবিতা কী

কবিতার বাক্যগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। কবিতার ভাষাকে সুন্দর করার জন্য ছন্দ ও মিলের ব্যবহার করা হয়। ছন্দ হলো নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে থেমে থেমে বলা। আর মিল হলো একই রকম উচ্চারণের শব্দ। গদ্য রচনায় যেমন অনুচ্ছেদ থাকে, তেমনি কবিতায়ও ছোটো ছোটো অংশ থাকে, যাকে বলে স্তবক। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের বলে কবি। অনেকগুলো কবিতা নিয়ে যে বই হয়, তার নাম কাব্য। কবিতার ভাষাকে পদ্য-ভাষা বলা হয়।

কবিতায় সাধারণত পর পর দুই লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে। এর বাইরেও কবিরা নানা ভাবে মিল তৈরি করেন। যেমন, 'মাঝি' কবিতার একই রকম মিল একাধিক লাইনের শেষে আছে। যেমন: পারে–ধারে–সারে, ফেলে–জেলে–ছেলে ইত্যাদি।

কবিতায় শব্দ-রূপের পরিবর্তন হয়। 'ময়নামতীর চর' কবিতায় কিছু শব্দের রূপের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। অন্য কবিতায়ও এ রকম পরবর্তিত শব্দ দেখা যাবে। তাছাড়া পদ্যের ভাষা গদ্যের ভাষার মতো হয় না। যে কোনো কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর করলে বিষয়টি বোঝা যায়।

তাল রেখে পড়ার ব্যাপারটি কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তালের ভিত্তিতে নানা রকম ছন্দ তৈরি হয়। 'নোলক' কবিতার মতো অন্যান্য কবিতাও তালে তালে পড়া যায়।

কবিতা লিখি

কবিতা লেখা যায় যে কোনো বিষয় নিয়ে। এই বিষয় হতে পারে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু, কোনো ঘটনা বা কাহিনি। কবিতার মধ্যে মনের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পায়। নিচের ফাঁকা জায়গায় তুমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে একটি কবিতা লেখো। লেখার সময়ে কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রেখো। কবিতার একটি নাম দাও।

....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

যাচাই করি

তোমার লেখা কবিতায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. লাইনের শেষে মিল-শব্দ আছে কি না।

২. তালে তালে পড়া যায় কি না।

৩. লাইনগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কি না।

৪. এর ভাষা গদ্যের ভাষার চেয়ে আলাদা কি না।

৫. শব্দের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।

একজনের লেখা কবিতা অন্যকে পড়তে দাও। প্রত্যেকের কবিতা নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করো।

২য় পরিচ্ছেদ

ছড়া

ছড়া পড়ি

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও ছড়া-কবিতা লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে 'পথে প্রবাসে', 'বাংলাদেশে', 'উড়কি ধানের মুড়কি' ইত্যাদি। নিচে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি ছড়া দেওয়া হলো। এটি তাঁর 'রাঙা মাথায় চিরুনি' ছড়ার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

ছড়াটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে পড়ো।

ঢাকাই ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

বলছি শোনো কী ব্যাপার
ডাকল আমায় পদ্মাপার
আধ ঘণ্টা আকাশ পাড়ি
তারই জন্যে কী ঝকমারি।

অবশেষে পেলেম ছাড়া
বিমানেতে ওঠার তাড়া।
পেয়ে গেলেম যেমন চাই
বাতায়নের ধারেই ঠাঁই।

এই কি সেই পদ্মা নদী
সিন্ধুসম যার অবধি?
আঁকাবাঁকা জলের রেখা
পালতোলা নাও যায় যে দেখা।

একটু বাদে এ কোন শহর
ঢাকা নাকি? বেশ তো বহর!
বিমান যখন থামল এসে
পৌঁছে গেলাম ভিন্ন দেশে।

মোদের গরব মোদের আশা
শ্রবণ জুড়ায় বাংলা ভাষা।
বন্ধুজনের দর্শনে
নয়ন জুড়ায় হর্ষণে।

বাংলা লিপি দিকে দিকে
জয়ের চিহ্ন গেছে লিখে।
কোথায় গেল পাকিস্তান
খান সেনা আর টিক্কা খান।

রাজার বাগ আর রায়ের বাজার
বধ্যভূমি ইটের পাঁজার।
মেলে দেখি মানসনেত্র
কারবালা কি কুরুক্ষেত্র।

একেই ঘিরে হবে লিখা
মহান কত আখ্যায়িকা।
নতুন লেখক সম্প্রদায়
নেবেন এসে লেখার দায়।

শব্দের অর্থ

অবধি: বিস্তার।
আখ্যায়িকা: কাহিনি।
ইটের পাঁজা: ইটের স্তূপ।
কারবালা: ইরাকের একটি জায়গার নাম, যেখানে এজিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ইমাম হোসেন (রা) শহিদ হন।
কুরুক্ষেত্র: মহাভারতে উল্লেখিত একটি জায়গার নাম, যেখানে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।
খান সেনা: পাকিস্তানি সৈন্য।
ঝকমারি: ঝামেলা।
টিক্কা খান: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক।
দর্শন: দেখা।
বধ্যভূমি: যেখানে মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।
বহর: আয়তন।
বাতায়ন: জানালা।
মানসনেত্র: মনের চোখ।
রাজার বাগ: ঢাকা শহরের একটি জায়গা, যেখানে পুলিশের ব্যারাক আছে। পঁচিশে মার্চ রাতে এখানে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পুলিশের প্রতিরোধ-যুদ্ধ হয়।
রায়ের বাজার: ঢাকা শহরের একটি জায়গা, মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা যেখানে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলে রাখে।
শ্রবণ: কান।
সম্প্রদায়: গোষ্ঠী।
হর্ষণ: আনন্দ।

ছড়া বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। 'ঢাকাই ছড়া' নামের ছড়ায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘ঢাকাই ছড়া’ নামের ছড়াটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

খেয়াল করি

‘ঢাকাই ছড়া’ পড়ার সময়ে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করি।

১. লাইনের শেষে মিল-শব্দ আছে কি না।

২. শব্দ-রূপের পরিবর্তন হয়েছে কি না।

৩. তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায় কি না।

১. মিল-শব্দগুলো নিচে লেখো:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

২. পরিবর্তিত শব্দগুলো নিচে লেখো। একইসঙ্গে শব্দগুলোর প্রমিত রূপ পাশে দেখাও। একটি করে দেখানো হলো।

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
আমায়	আমাকে

৩. কোথায় কোথায় তাল পড়ছে দাগ দিয়ে দেখাও। প্রথম চার লাইন করে দেখানো হলো। (তাল বোঝার জন্য ছড়াটি পড়ার সময়ে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়ো। খেয়াল করো, এখানে প্রতি লাইনে দুটি করে অংশ পাওয়া যাচ্ছে।)

/বলছি শোনো /কী ব্যাপার
/ডাকল আমায় /পদ্মাপার
/আধা ঘণ্টা /আকাশ পাড়ি
/তারই জন্যে /কী ঝকমারি।

অবশেষে পেলেম ছাড়া
বিমানেতে ওঠার তাড়া।
পেয়ে গেলেম যেমন চাই
বাতায়নের ধারেই ঠাঁই।

এই কি সেই পদ্মা নদী
সিন্ধুসম যার অবধি?
আঁকাবাঁকা জলের রেখা
পালতোলা নাও যায় যে দেখা।

একটু বাদে এ কোন্ শহর
ঢাকা নাকি? বেশ তো বহর!
বিমান যখন থামল এসে
পৌঁছে গেলাম ভিন্ন দেশে।

মোদের গরব মোদের আশা
শ্রবণ জুড়ায় বাংলা ভাষা।
বন্ধুজনের দর্শনে
নয়ন জুড়ায় হর্ষণে।

বাংলা লিপি দিকে দিকে
জয়ের চিহ্ন গেছে লিখে।
কোথায় গেল পাকিস্তান
খান্ সেনা আর টিক্কা খান্।
রাজার বাগ আর রায়ের বাজার
বধ্যভূমি ইটের পাঁজার।
মেলে দেখি মানসনেত্র
কারবালা কি কুরুক্ষেত্র।

একেই ঘিরে হবে লিখা
মহান কত আখ্যায়িকা।
নতুন লেখক সম্প্রদায়
নেবেন এসে লেখার দায়।

ছড়ার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ছড়ার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

কবিতা ও ছড়ার সম্পর্ক

কবিতার সঙ্গে ছড়ার মিল রয়েছে অনেক জায়গায়। তবে, এই মিলের ভেতরেও কবিতার মধ্যে ছড়াকে আলাদা করে চেনা যায়।

১. কবিতায় মিল-শব্দ থাকে। কোনো কবিতায় লাইনের শেষে মিল-শব্দ নাও থাকতে পারে। তবে ছড়ায় অবশ্যই লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে।
২. কবিতার মতো ছড়াতেও শব্দরূপের পরিবর্তন হয়।
৩. কবিতা তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায়। এই তাল কখনো ধীর গতিতে পড়ে, কখনো দ্রুত গতিতে পড়ে। আবার কোনো কোনো কবিতায় তাল একেবারেই থাকে না। তবে, ছড়া অবশ্যই তাল দিয়ে পড়া যায়। আর সেই তালও পড়ে খুব ঘন ঘন।

ছড়া কী

ছড়া মূলত শিশুদের জন্য বানানো কবিতা। ছড়ার প্রতি জোড়া লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে এবং দ্রুত তালে পড়া যায়। ছড়ার আয়তন সাধারণত ছোটো হয়। ছড়ার লাইনগুলোও আকারে ছোটো হয়ে থাকে। কবিতার মতো ছড়াও যে কোনো বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে। অনেক সময়ে অকারণ বা অর্থহীন বিষয় নিয়েও আবোল-তাবোল ছড়া লেখা হয়।

যাঁরা ছড়া লেখেন তাঁদের বলে ছড়াকার।

৩য় পরিচ্ছেদ

গান

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। তাঁর লেখা 'চল্ চল্ চল্' গানটি বাংলাদেশের রণসংগীত। তিনি নানা বিষয় নিয়ে গান লিখেছেন এবং সেসব গানে নতুন নতুন সুর দিয়েছেন। এছাড়া তিনি গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও নাটক লিখেছেন। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'শিউলিমালা', 'যুগবাণী' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। নিচে কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান দেওয়া হলো।

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম

কাজী নজরুল ইসলাম

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল ॥
মোরা আকাশের মতো বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন,

মোরা জানি না কো রাজা রাজ-আইন,
মোরা পারি না শাসন-উদূখল!
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল-কল্
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা-জল
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

মোরা দিল-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর,
মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্,
মোরা মুক্তধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল ॥

শব্দের অর্থ

ঝঞ্ঝা: ঝড়।

উদ্দাম: বাধাহীন।

নির্ভয়: ভয়হীন।

প্রকৃতি: চারপাশের জগৎ।

সচ্ছল: পরিপূর্ণ।

মরু-সঞ্চর বেদুইন: মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো যাযাবর।

রাজ-আইন: রাজার আইন।

উদূখল: মুষল, মুগুর।

শতদল: পদ্ম।

সিন্ধু-জোয়ার: সাগরের জোয়ার।

পাগলা-ঝোরা: উদ্দাম ঝরনা।

ঝরা-জল: ঝরে পড়া জল।

দিল-খোলা: প্রাণখোলা।

প্রান্তর: মাঠ

অটল: টলানো যায় না এমন।

মহীধর: পাহাড়।

মুক্ত-পক্ষ: ডানা-খোলা।

নভ-চর: যা আকাশে চরে বেড়ায়।

উচ্ছল: চঞ্চল।

বনফল: বুনো ফল।

শয্যা: বিছানা।

শ্যামল: ঘন সবুজ।

বন-তল: বনভূমি।

দরিয়া: সাগর।

মুক্তধারা: বাধাহীন স্রোত।

গান গাই

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানটি সবাই মিলে গাও।

গান বুঝি

উপরের গানে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কিছু প্রশ্ন লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

কবিতার সাথে গানের কী কী পার্থক্য আছে, দলে আলোচনা করে বের করো। গানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

গান কী

সুর করে গাওয়া কথাকে গান বলে। গানের মধ্যে বিশেষ কোনো আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশ পায়।

গানের কথা যাঁরা লেখেন, তাঁদের বলা হয় গীতিকার। গীতিকাররা গানের কথাকে কবিতার মতো করে লেখেন। এই কথা অনুযায়ী গানের নানা রকম নাম হয়, যেমন: পল্লিগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত ইত্যাদি।

গানের কথায় নানা রকম সুর থাকে। সুর হলো কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা। সুরের এককের নাম স্বর। এই স্বর মূলত সাতটি: সা রে গা মা পা ধা নি। যাঁরা গানে সুর দেন, তাঁদের বলে সুরকার।

গানে নানা রকম তাল থাকে। গানের সুর ও তাল ঠিক রাখার জন্য অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, যেমন: হারমোনিয়াম, তবলা, একতারা, তানপুরা, গিটার ইত্যাদি। যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজান, তাঁদের বলা হয় বাদক বা যন্ত্রশিল্পী।

গানের কথা, সুর ও তাল মেনে যিনি গান পরিবেশন করেন, তাঁকে বলা হয় গায়ক বা শিল্পী।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

গল্প

গল্প পড়ি ১

শওকত ওসমানের জন্ম ১৯১৭ সালে এবং মৃত্যু ১৯৯৮ সালে। তিনি অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'জাহান্নম হইতে বিদায়' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইয়ের মধ্যে আছে 'ওটন সাহেবের বাংলো', 'মসকুইটো ফোন' ইত্যাদি। নিচে শওকত ওসমানের একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

তোলপাড়

শওকত ওসমান

একদিন বিকেলে হন্তদন্ত সাবু উঠান থেকে 'মা মা' চিৎকার দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। জৈতুন বিবি হকচকিয়ে যায়। রান্নাঘরে পাক করছিল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শুধায়, কী রে–এত চিক্কর পাড়স ক্যান?

–মা, ঢাকা শহরে গুলি কইরা মানুষ মারছে–

–কে মারছে?

–পাঞ্জাবি মিলিটারি।

দেখা যায় সাবু খুব উত্তেজিত। মুখ দিয়ে কথা তাড়াতাড়ি বের করে দিতে চাইলেও পারে না। কারণ, শরীর থরথর কাঁপছে। হাতে মুঠি বারবার শক্ত হয়।

–মা, একজন দুজন না। হাজার হাজার মানুষ মারছে।

–কস কী, হাজার হাজার?

–হ, সব মানুষ শহর ছাইড়া চইলা আইতাছে।

ঢাকা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী গাবতলি গ্রাম। কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা নেই। তাই সব খবরই দুদিন বাদে এসে পৌঁছায়। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। পরদিনেই পাওয়া গেছে সব খবর। যারা জওয়ান তারা সোজা হেঁটে হেঁটে বাড়ি পৌঁছেছে। তাই খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাঞ্জাবি মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে।

পরদিন সাবুর সামনে গোটা শহর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে জেলা বোর্ডের সড়ক। সেই পথে মানুষ আসতে লাগল। একজন দুজন নয়, হাজার হাজার। একদম পিলপিল পিঁপড়ের সারি। গাবতলি গ্রাম তাদের গন্তব্য নয়। আরও দূরে যাবে তারা। কেউ কুমিল্লা, কেউ নোয়াখালি, কেউ ময়মনসিংহ–একদম গারো পাহাড়ের কাছাকাছি, আরও নানা এলাকায়।

দারুণ রোদ্দুর মাথার উপরে। আর ভিড়। নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাপ বাড়ে। হাঁটার জন্য ক্লান্তি বাড়ে। সব মিলিয়ে জওয়ান মানুষেরাই খাবি খাচ্ছে। মেয়ে, শিশু এবং বেশি বয়সীদের তো কথাই নেই। ক্ষুধার কথা চুলোয় যাক, পিয়াসে ছাতি ফেটে দুতিন জন রাস্তার ধারেই শেষ হয়ে গেল।

জৈতুন বিবি মুড়ি ভেজে দিয়েছিল খুব ভোর-ভোর উঠে। সাবু চাঙারি বোঝাই করে মুড়ি এনে ওদের খাইয়েছে। নিজেরা কীভাবে চলবে সে কথা ভাবেনি। মুড়ি শেষ হলে সে পানি জোগানোর কাজে এগিয়ে গেছে।

এক প্রৌঢ় নারীকে দেখে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ দেখে বোঝা যায় অনেক হেঁটেছেন, অথচ তার জীবনে হাঁটার অভ্যেস নেই। সাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

–মা, পানি খাবেন?

-দাও, বাবা। প্রৌঢ় নারী মুখ খুললেন। গ্লাস আবার ধুয়ে জালা থেকে পানি এগিয়ে দিয়েছিল সাবু। খালি গা। পরনে হাফপ্যান্ট, তাও ময়লা। বড়ো লজ্জা লাগে সাবুর। প্রৌঢ়া পানি খেয়ে তৃপ্ত। হাতে চামড়ার উপর নকশা-আঁকা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট সাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা, তুমি কিছু কিনে খেও।

-এ কী! না-না-

-নাও, বাবা।

-মাফ করবেন। টাকা নিলে আমারে মা বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিব। আমারে কইয়া দিছে, শহেরের কত গণ্যমান্য মানুষ যাইব রাস্তা দিয়া! পয়সা দিলে নিবি না। খবরদার।

সেই পৌঢ়া নারী একটু হাঁফ ছেড়ে বললেন, তোমার মা কিছু বলবেন না।

–আমার মারে আপনি চেনেন না। মা কন, বিপদে পইড়া মানুষ বাড়ি আইলে কিছু লওয়া উচিত না। গরিব হইতাম পারি, কিন্তু আমরা জানোয়ার না।

শেষ কথাগুলোর পর নিরুপায় সেই নারী সাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, যদি কখনো ঢাকা শহরে যাও, আমাদের বাড়িতে এসো।

–আপনাদের বাড়ি?

–লালমাটিয়া ব্লক ডি। আমি মিসেস রহমান।

মিসেস রহমান আবার রাস্তা ধরলেন। সাবু বুঝতে পারে, এই গরমে হাঁটার পক্ষে মোটা শরীর আদৌ আরামের নয়। বেচারা নিরুপায়। শরীর তো আর নিজে তৈরি করেননি।

তিনি নিমেষে ভিড়ে মিশে গেলেন। ভিড় নয় স্রোত। শহর থেকে যে শুধু গণ্যমান্য মানুষ আসছে, তা নয়। সাধারণ মজুর-মিস্ত্রিরা পর্যন্ত আসছে। সাবু ভাবে, তা হলে শহরেও গরিব আছে, যারা তাদের মতোই কোনো রকমে দিন কাটায়, তাদেরই মতো যাদের ঠিকমতো বিশ্রাম জোটে না, আহার জোটে না, কাপড় জোটে না। এই সময় সাবুর আরো মনে হয়, একবার শহর দেখে এলে হতো। লোক তো শহর পর্যন্ত আছেই। এই জনস্রোত ধরে উজানে ঠেলে গেলেই সেখানে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু তার সাহস হয় না।

একদিন তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গেল আট-নয় জনের একটি পরিবার। সম্ভ্রান্ত জন তারা। সত্তর বছরের বুড়ো তাদের সঙ্গে। তিনটি মাঝ-বয়সী মেয়ে–ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স–তাকে ধরে ধরে আনছে। সঙ্গে আরো পাঁচ-ছয়টি কুঁচো ছেলেমেয়ে, কেউ আট বছরের বেশি নয়। আর আছে লুঙ্গি পরা হাফ শার্ট পরিহিত জওয়ান একজন। তার চেহারা জানান দেয় বাড়ির কাজের লোক। বুড়ো ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। কখনো মেয়ে তিনটির সাহায্য নেয়, কখনো জওয়ান কাজের লোকের! পাঁচ-ছটি কুঁচো ছেলেমেয়ের খবরদারিও সহজ নয়। কাজেই এই কাফেলা রীতিমতো নাজেহাল। আকাশে তেমনি কাঠফাটা রোদ।

শোনা গেল, বুড়োর তিন ছেলেকেই তার সামনে পাঞ্জাবি মিলিটারিরা গুলি করে মেরেছে। সঙ্গী মেয়ে তিনটি বিধবা বউ। কুঁচো ছেলেমেয়েগুলো বুড়োর নাতি-নাতনি।

গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে তারা বসেছিল। খবর জানার কৌতূহলে গাবতলি গাঁয়ের অনেকে ছুটে আসে। আজ কিন্তু কাছে এসে সবাই মিলে যায়। সদ্য বিধবা তিনজন। আর সঙ্গে অমন জয়িফ মানুষ। কেউ মিলিটারির জুলুমের খবর জানবার জন্য আগ্রহ দেখায় না। বরং কীভাবে এদের সাহায্য করতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা করে।

পিয়াসে সকলেই অস্থির ছিল। কে একজন তাড়াতাড়ি ছোটো কলস আর গ্লাস নিয়ে এল। কিন্তু এই সামান্য আতিথেয়তায় কেউ সন্তুষ্ট নয়। সাবু নিজেও ভেবে পায় না কীভাবে উপকার করবে! আগে ফায়-ফরমাশ খাটতে কী বিরক্ত লাগত। আর এখন কিছু করতে না পারলে অসোয়াস্তি।

বুড়ো ভদ্রলোক রাজি ছিল না। তবু কয়েকজন উপযাচক হয়ে বিভিন্ন ভার নিল। সাবুও বাদ গেল না। সে একটা কচি ছেলেকে কোলে তুলে নিল। দুই মাইল দূরে নদীর ঘাট। সবাই মিলে পালা করে কাঁধে নিয়ে বুড়ো মানুষটিকে নদীর ঘাট পর্যন্ত দিয়ে আসবে। তারপর নৌকায় তুলে দেবে।

সাবুর কোলে গোলগাল বাচ্চাটা। বছর তিন বয়স। বেশ ভারি। কিন্তু ক্লান্তি নেই সাবুর। মাঝে মাঝে অন্য কেউ তার বোঝা হালকা করতে চাইলে সে বলে, আর একটু আগাইয়া দিই।

বৃদ্ধ আশেপাশের বাহকদের বলে, তোমরাই আমার ছেলে, বাবা। এই গরমে তোমরা ছাড়া কে আর এমন সাহায্য করত। ছেলে আর কোথায় পাব–কথা শেষ হয় না, ফোঁপানির শব্দ ওঠে।

আবার বুড়োর ভাঙা ভাঙা গলা শোনা যায়, জীবনে নামাজ কাজা করিনি, বাবা। ইসলামের নাম নিয়ে বলল, পাকিস্তান হলে মুসলমানদের মঙ্গল হবে। হা–এই বয়সে সব ছেলেদের হারিয়ে–বুড়ো কথা শেষ করতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় শুধু।

সমস্ত কাফেলা নীরব। নারীদের মধ্যে একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছিল। তখনেই থেমে গেল। কে আর কথা বলবে এমন জায়গায়। মনে হচ্ছিল, কতগুলো লাশ নিয়ে যেন সবাই হাঁটছে।

সাবু কল্পনার চোখে যেন সামনে দেখতে পায়:

খাকি উর্দি পরা কতগুলো সিপাই তার সামনে। আর সে তাদের লাথি মেরে মেরে ফুটবলের মতো গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অসীম আক্রোশে তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সেই সব দুশমন কখনও দেখেনি সে। সেই সব জানোয়ার কখনও দেখেনি, যারা তার দেশের মানুষকে বন্যার দিনের পিঁপড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুলুমের দাপটে।

অমন জন্তুদের মোকাবিলার জন্য তার কিশোর বুকে আশ্চর্য তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

শব্দের অর্থ

অসোয়াস্তি: খারাপ লাগা।

উপযাচক: যে যেচে কিছু করে।

উর্দি: সৈনিকদের পোশাক।

কাফেলা: পথিকের দল।

কুঁচো: ছোটো।

খাবি খাওয়া: অসুবিধা বোধ করা।

গারো পাহাড়: নেত্রকোণা জেলায় অবস্থিত পাহাড়ের নাম।

চাঙারি: বাঁশ বা বেতের তৈরি ছোটো পাত্র।

চিক্কর: চিৎকার।

জয়িফ: অতি বৃদ্ধ।

জালা: মাটির তৈরি পেট মোটা বড়ো পাত্র।

নাজেহাল: অতিশয় ক্লান্ত।

নিমেষে: চোখের পলকে।

পঁচিশে মার্চ: ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ। এই তারিখ রাতে পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে।

পাঞ্জাবি মিলিটারি: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাধারণ নাম।

প্রৌঢ়: মধ্যবয়সী।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

'তোলপাড়' গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'তোলপাড়' গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গল্প পড়ি ২

হালিমা খাতুনের জন্ম ১৯৩৩ সালে এবং মৃত্যু ২০১৮ সালে। তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন; এজন্য তাঁকে ভাষাসৈনিক বলা হয়। হালিমা খাতুন ছোটোদের জন্য অনেক লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে ‘পাখির ছানা’, ‘পিকনিকে’ ইত্যাদি। নিচে তাঁর লেখা একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

আষাঢ়ের এক রাতে

হালিমা খাতুন

একবার দাদার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে আবু বিশাল একটা বোয়াল মাছ ধরেছিল। তখন ছিল আষাঢ় মাস। ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছিল থেকে থেকে। আর বিদ্যুতের ঝলক আকাশের ওপরে সোনার দাগ কেটে পালিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। যাবার সময় মেঘের আড়াল থেকে তবলার শব্দ শুনিয়ে দিচ্ছিল। আবুর যে বয়স তাতে তার ঘন বর্ষার রাতে মৌরী বিলে মাছ ধরতে যাবার কথা নয়। কারণ বয়স তার মোটে দশ। বড়ো ভাইয়েরা কোনো সময় তাকে সাথে নিতে চায় না। বোয়াল মাছ ধরার দিনও দাদা সাজেদ ও তার বন্ধুরা একেবারেই জানতে পারেনি যে ছোট্ট আবু তাদের সাথে যাচ্ছে। বলে কয়ে যেতে চাইলে দাদারা ওকে সাথে নেবে না। তাই বেচারা আবু চুপি চুপি গিয়ে নৌকার খোলের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে শুয়েছিল এবং সেখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বর্ষাকালে মানে আষাঢ় এলেই মৌরী বিলে প্রচুর মাছ পড়ে। বোয়াল, পাঙ্গাস থেকে শুরু করে ট্যাংরা, পুঁটি, পারশে, বেলে সবই পাওয়া যেত। আবুর বড়ো ভাই সাজেদের মাছ ধরার নেশা খুব। অনেকবার সে বড়ো বড়ো মাছ ধরেছে। এবারও দুই বন্ধু বিপুল আর বায়েজিদকে নিয়ে সে মাছ ধরার প্ল্যান করেছিল। তারপর সব গোছগাছ করে বাড়ির নৌকাটা নিয়ে মৌরী বিলের পথে রওনা হলো। সাথে নিল কয়েক রকম জাল, হেরিকেন, মাছ আনার বড়ো বড়ো খালুই। আর নিল রাতের খাবার। নৌকা বাইবে কিষান তিনু। দরকার হলে এরাও হাত লাগাবে। অতিরিক্ত দুটো বৈঠাও সাথে করে নিল তারা।

ওদিকে আবু ছটফট করছে কী করে সে ওদের সাথে যাবে। বিপুল ও বায়েজিদকে নিয়ে সাজেদ যখন নৌকায় মৌরী বিলে যাবার পাকাপাকি প্লান করছিল, তখন আবু তো শুনে মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে সে ওদের সাথে যাবেই যাবে। তাতে যা হয় হবে। আবুর এই গোপন প্লান সাজেদরা কিছুই জানতে পারেনি। আকাশে মেঘ, তাই তারা সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ল। মাছ ধরা হবে রাতে। হেরিকেনের আলো দেখলে মাছেরা কেমন যেন রাতকানা হয়ে যায়। তখন মাছ-শিকারিরা জাল দিয়ে ধরে ফেলে সেই পথভোলা মাছগুলোকে।

কিছুদূর যাবার পর ঝর ঝর করে বৃষ্টি নামল। ওরা তিন জন ছাতা মাথায় দিলো। মাথাল মাথায় তিনু নৌকার হাল ধরে বসে রইল। সন্ধ্যা হলো। বৃষ্টি থামল। হেরিকেন জ্বালাল ওরা। একটু পরেই হেরিকেন নিবু নিবু হয়ে এল। সাজেদ হেরিকেনটা নাড়িয়ে দেখে তেল নেই একটুও তাতে। নৌকার খোলের মধ্যে কেরোসিন তেলের বোতল। পাটাতনের তক্তা তুলে দেখে সেখানে ছোটো মতো কে যেন শুয়ে আছে। সাজেদ চেঁচিয়ে উঠল–

: এই বিপুল। এই বায়েজিদ। দ্যাখ এখানে কে যেন শুয়ে আছে।

: কে আবার নৌকার খোলের মধ্যে শুতে যাবে। বোধ হয় ধানের বস্তা। কিষানেরা নামাতে ভুলে গেছে।

: না, বস্তা না। এই কে তুই? কে? কে? বলে সাজেদ শোয়া ব্যক্তিকে ঠেলা দিলো।

আবু তখন হুড়মুড় করে উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে বলল, আমি আবু। বলেই সে কেঁদে দিয়েছে। সাজেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আবু তুই এখানে কী করে এলি? শয়তান, আজ তোকে পিটিয়ে ঠান্ডা করব। কাউকে না বলে চলে এসেছিস। বাড়িতে সবাই তো কান্নাকাটি শুরু করেছে। তাহালে তো মাছ ধরা যাবে না। বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

আবু তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দাদা মেরো না আমাকে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি মাছ ধরার জন্য। তবে কালুকে বলে এসেছি কেউ খুঁজলে বলে দিতে।'

: ভালো কথা। বুদ্ধির কাজ করেছিস। তা পুচকে ছেলে তুই কী মাছ ধরবি?

: বড়ো মাছ ধরব দাদা।

: বেশ থাক। বড়ো মাছ তোকেই ধরে না নিয়ে যায় দেখিস। দাদার আশ্বাস পেয়ে আবু মনের সুখে গান ধরল: চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।

সাজেদ শুনে বলল, 'মাদল তোর মাথায় না পড়ে! তুই বরং পাটাতনের নিচে তোর জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাক। মাছ এসে তোকে ডেকে তুলবে।'

: না আমি ঘুমাব না। বড়ো মাছ ধরব। তোমরা মাছ ধরবে আর আমি ঘুমিয়ে থাকব, তা হবে না! তা হবে না!

: তা তুই মাছ কী দিয়ে ধরবি?

: আমি বড়শি আর টোপ নিয়ে এসেছি।

আবু তখন তার পুটুলি থেকে বড়শি আর টোপ বের করে দেখাল। তা দেখে সাজেদ ও তার বন্ধুরা হেসেই গড়াগড়ি। এমন অদ্ভুত বড়শি আর টোপ তারা কখনও দেখেনি। সাজেদ বলল–

: ও, এই তোর বড়শি কেরোসিনের টিনের আংটা দিয়ে বানানো! এ দিয়ে মাছ কেন কুমিরও ধরতে পারবি। জলহস্তী তো আমাদের দেশে নেই। থাকলে তাও তোর এই বড়শি দিয়ে ধরতে পারতিস। তা দেখি তোর টোপ। ও, তেলাপোকা। তেলাপোকা কি মাছে খায়?

: খায় খায়, আমি জানি।

: ঠিক আছে তুই নৌকায় বসে কুমির, জলহস্তী যা খুশি ধর। আমরা পানিতে নেমে জাল ফেলব। দেখিস ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। আর তিনু ভাই তুমি ওকে দেখ। আমরা চললাম। দেরি হয়ে গেল অনেক। আর দেরি করলে মাছ পাওয়া যাবে না। তোর জন্য খালি খালি সময় নষ্ট হলো। বলে কয়ে এলে কী হতো?

আবু কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। একা নৌকায় থাকতে পেরে আবুর খুব আনন্দ হলো। সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরার সরঞ্জাম বের করল। তার দুটো বড়শিতে তেলাপোকার টোপ গেঁথে পানিতে ছুঁড়ে দিলো। তারপর বড়শির দড়ি নৌকার গলুইয়ের সাথে জড়িয়ে বেঁধে বসে রইল। অন্ধকার চারদিক। কেবল মাছ শিকারিদের হেরিকেনের আলো বিলের পানিতে নেচে চলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মনে হচ্ছে আকাশটাকে কে যেন সোনার কাঠি দিয়ে ভাগ করছে।

আবুর মনে খালি একটাই ভয়। বড়শিতে মাছ ধরা পড়বে কি না। এত কষ্ট করে লুকিয়ে এসে যদি মাছ না পায় তাহলে তো সবাই খেপাবে। আর মারও খেতে হবে নিশ্চয়ই। বড়শির দড়ির সাথে কয়েকটা জোনাকি পলিথিনের থলের মধ্যে ভরে ফাতনার মতো বেঁধে দিয়েছিল। সেই জোনাকি ফাতনার দিকে সে চেয়ে বসেছিল। সুবোধ কাকার কাছে সে শুনেছিল যে বোয়াল মাছ তেলাপোকা ভালোবাসে। তাই সে তেলাপোকার টোপ দিয়ে বড়শি ফেলার কথা ভেবেছিল। কাকা নাকি একবার তেলাপোকার টোপ দিয়ে পাঁচটা চিতল মাছ ধরেছিল। সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। যা হোক, আবু ভাবতে লাগল মাছের কথা। এমন সময়ে দেখল ফাতনাটা শাঁ করে পানির মধ্যে ডুবে গেল। সে তাড়াতাড়ি গলুইয়ের সাথে বাঁধা বড়শির দড়ি ছাড়াতে লাগল। ছাড়াতে ছাড়াতে দড়ি প্রায় শেষ হয়ে গেল। তারপর সে দড়ি টেনে টেনে আবার গলুইয়ের সাথে জড়াতে লাগল। প্রথমে দড়িতে ভার লাগল না। তার মনটাই দমে গেল। কিন্তু একটু পরেই দড়িতে ভার বোধ হতে লাগল আর খুব টানাটানি শুরু হয়ে গেল। এমন সময় বৃষ্টি নামল।

তিনু হাল ধরে বসেছিল। আবু তিনুকে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, তিনু ভাই তিনু ভাই। বড়ো মাছ, শিগগির আস। তিনু বলল–

: ধুর পাগল! এই বিলে বড়ো মাছ কোথা থেকে আসবে। খাল, বিল তো এখন মরেই গেছে। আগের দিন হলে কথা ছিল।

: না বড়ো মাছে ধরেছে। তুমি এসো তিনু ভাই। আমার হাত কেটে যাচ্ছে।

তিনু তখন এগিয়ে এসে বড়শির দড়ি ধরল। তারা দুজনে ধরে দড়ি জড়াতে লাগল হালের খুঁটির সাথে। জড়াতে জড়াতে ওরা দুজন একদম ক্লান্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনও ঝরছে। ওরা ভিজে ভিজে একাকার। কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে ওরা বড়শির দড়ি টেনে যেতে লাগল। টানতে টানতে শেষে একটা হ্যাঁচকা টান দিতে বিশাল বড়ো কী যেন একটা নৌকার খোলের মধ্যে দড়াম করে এসে পড়ল। আর এলোপাথাড়ি লাফালাফি করতে লাগল।

তাতে নৌকা প্রায় ডুবে যাবার মতো হলো। তখন জোর বিদ্যুৎ চমকাল। ওরা সেই আলোতেই দেখল বিশাল একটা বোয়াল মাছ, প্রায় আবুর সমান। বোয়াল লাফাতে লাগল। তিনু তখন খোলের তলা থেকে একটা বস্তা এনে বোয়ালের গায়ে চাপা দিলো। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বোয়াল শান্ত হলো। আবুর খুশির নাচ তখন কে দেখে!

এমন সময়ে সাজেদরা ফিরে এল। আজ তাদের জালে পুঁটি ছাড়া কিছুই ধরা পড়েনি। তাই রাগ করে তারা তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। এসেই দেখে আবুর বিশাল বোয়াল। দেখে তাদের বিশ্বাস হতে চায় না। সাজেদ বলল, ‘এই আবু, অত বড়ো বোয়াল কোথা থেকে এল?’ আবু বলল, ‘পানি থেকে। আর আমি ধরেছি!’

শব্দের অর্থ

এলোপাথাড়ি: এদিক ওদিক।

কিষান: কৃষি-মজুর।

খালুই: মাছ রাখার ঝুড়ি।

গলুই: নৌকার দুই মাথার সরু অংশ।

জোনাকি: অন্ধকারে জ্বলে-নেভে এমন এক ধরনের পোকা।

টোপ: মাছ ধরার জন্য বড়শিতে গেঁথে দেওয়া খাবার।

ধস্তাধস্তি: কোস্তাকুস্তি।

নৌকার খোল: নৌকার পাটাতনের নিচের ফাঁকা জায়গা।

পাকাপাকি প্লান: চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

পাটাতন: কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি নৌকার মেঝে।

পুচকে: খুব ছোটো।

ফাতনা: বড়শির সুতায় বাঁধা ভাসমান কাঠি বা শোলা।

বড়শি: বাঁকা ও আলযুক্ত লোহার কাঁটা যাতে মাছের টোপ গাঁথা হয়।

মাথাল: রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য বাঁশ বা পাতা দিয়ে তৈরি টুপি।

মাদল: এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

রাতকানা: রাতে ভালো দেখতে পায় না এমন।

হাল: নৌকার দিক ঠিক রাখার জন্য বিশেষ বৈঠা।

হেরিকেন: হারিকেন; কাচ দিয়ে ঘেরা কেরোসিনের বাতি।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

গল্পের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

গল্প কী

কাহিনি বলার জন্য লেখক গদ্য ভাষায় যে রচনা তৈরি করেন, তাকে গল্প বলে। গল্প আয়তনে সাধারণত ছোটো হয়ে থাকে। তবে বড়ো আয়তনের গল্পকে বলে উপন্যাস। যিনি গল্প লেখেন তিনি গল্পকার; আর যিনি উপন্যাস লেখেন, তিনি ঔপন্যাসিক। গল্পকার ও ঔপন্যাসিককে কথাসাহিত্যিক বলা হয়।

প্রতিটি গল্পের মধ্যে কাহিনি থাকে। যেমন, 'তোলপাড়' গল্পের কাহিনি: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় কিছু লোক প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর থেকে গ্রামে চলে যাচ্ছে এবং গ্রামের মানুষ তাদের সহযোগিতা করছে।

গল্পের কাহিনি গড়ে ওঠে কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যেমন, 'তোলপাড়' গল্পের কাহিনিতে আছে–সাবু, মিসেস রহমান, বৃদ্ধ লোক, গ্রামবাসী ইত্যাদি চরিত্র।

গল্পের চরিত্র অনেক সময়ে কথা বলে, সেসব কথাকে সংলাপ বলা হয়। যেমন, 'তোলপাড়' গল্পে মিসেস রহমানের মুখের সংলাপ: 'বাবা, তুমি কিছু কিনে খেও।'

গল্প লিখি

নিচের ফাঁকা জায়গায় বানিয়ে বানিয়ে তুমি একটি গল্প লেখো। গল্পটির একটি নাম দাও।

____

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

যাচাই করি

তোমার লেখা গল্প থেকে নিচের বিষয়গুলো খুঁজে বের করো এবং লেখো:

১. কাহিনি (মূল কাহিনি) ....

....

....

২. চরিত্র (কয়েকটি চরিত্রের নাম) ....

....

....

৩. সংলাপ (যদি থাকে, তার দু-একটি নমুনা) ....

....

....

....

....

৫ম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ পড়ি

শামসুজ্জামান খানের জন্ম ১৯৪০ সালে এবং মৃত্যু ২০২১ সালে। প্রবন্ধ রচনায় ও লোকসাহিত্য গবেষণায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে ‘ফোকলোর চর্চা’, ‘বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য’, ‘গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা’ ইত্যাদি। নিচে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ দেওয়া হলো।

প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

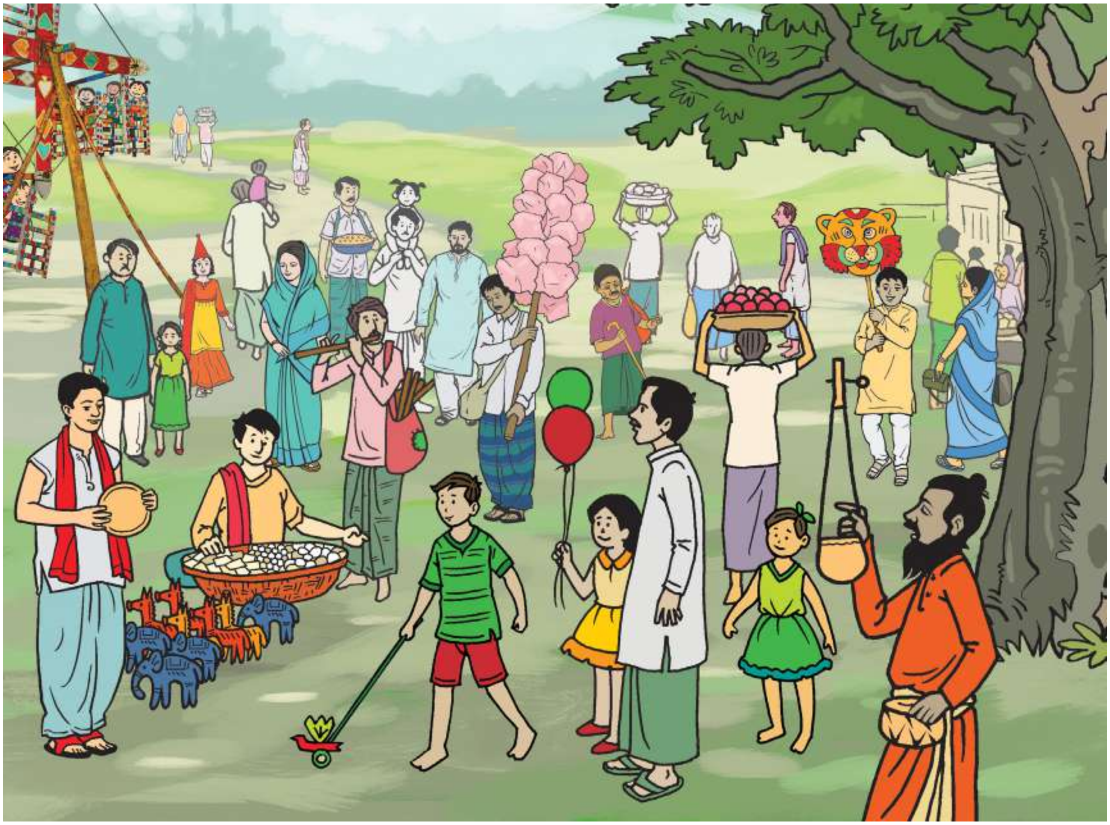

বাংলা নববর্ষ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতির আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাস নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার বাঙালিকে এ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। বাঙালি তার সংস্কৃতির উপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তখন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালি এ উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ববাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। এভাবেই বাঙালি জাতিসত্তা গঠন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ এবং তার উদ্‌যাপনের আয়োজন যুক্ত হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ববাংলার বাঙালি পিছু হটেনি। সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে ছায়ানট নববর্ষের উৎসব শুরু করে। স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যেসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।

এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মনে করেন মোগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজন্যই একে 'সন' বা 'সাল' বলে উল্লেখ করা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর 'সাল' হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বঙ্গাব্দও বলেন কেউ কেউ।

বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদারবাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখ করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় তা এখন লুপ্ত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। এ অনুষ্ঠান করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারা বছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। হালখাতা উপলক্ষে দোকানিরা ঝালর কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধুনা জ্বালানো হতো। মিষ্টিমুখ করানো হতো গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।

বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। সে মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন আর নেই। আগে গ্রামবাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না, আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, গরু-মোষের গাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহু সময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন হওয়ায় সে সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলনমেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এইসব মেলা। আবার বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।

নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানা স্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে ‘জব্বারের বলী খেলা’ বলা হয়।

নববর্ষের এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয়। নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে তারা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে ‘বৈসাবি’ নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জে হতো গোরুর দৌড়, হাডুডু খেলা; ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই; কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি।

আমাদের নববর্ষ উৎসব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে মেয়েরা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয়।

শব্দের অর্থ

আবহমান: চিরকালীন।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা: সব বয়সের নারী-পুরুষ।

ইলাহি সন: সম্রাট আকবরের চালু করা সাল।

ঐতিহ্য: গর্ব করার মতো পুরাতন বিষয়।

কবিগান: প্রতিযোগিতামূলক এক ধরনের লোকগান।

কারুপণ্য: কাঠ, বাঁশ, বেত ও মাটি দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র।

কীর্তন: রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান।

গম্ভীরা: অভিনয়-ভিত্তিক এক ধরনের লোকগান।

চান্দ্র হিজরি সন: চাঁদের হিসাবের সাথে মিল রেখে তৈরি হিজরি সন।

ছায়ানট: ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।

জাতিসত্তা: জাতির নিজস্ব পরিচয়।

জৌলুস: জাঁকজমক।

ঝালর কাটা: নকশা করে কাটা।

ধুমধাম: আড়ম্বর।

ধূপধুনা: সুগন্ধি দ্রব্য।

নাগরদোলা: চক্রাকারে ঘোরার দোলনা।

নেকমরদ: জায়গার নাম।

পরিপন্থী: বিরোধী।

পাকিস্তান আমল: ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ।

পুণ্যাহ: নববর্ষে খাজনা আদায়ের প্রতীকী অনুষ্ঠান।

পুতুল নাচ: কাপড় দিয়ে তৈরি করা পুতুল দিয়ে দেখানো নাচ।

পূর্ববাংলা: পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ যে নামে পরিচিত ছিল।

প্রতীকধর্মী: যা কোনো বিষয়কে ইঙ্গিত করে।

প্রবর্তন করা: চালু করা।

ফুঁসে ওঠা: প্রতিবাদী হওয়া।

বর্ণাঢ্য: বিচিত্র রংযুক্ত।

বৈসাবি: বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু নামের তিনটি অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম।

মঙ্গল শোভাযাত্রা: পহেলা বৈশাখে আয়োজিত আনন্দ মিছিল।

মুখর: কোলাহলপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী: পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার সরকার-প্রধানের পদ।

যাত্রা: এক ধরনের লোকনাটক।

যুক্তফ্রন্ট সরকার: ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় গঠিত একটি বহুদলীয় সরকার।

রমনা: ঢাকার একটি জায়গার নাম।

লুপ্ত হওয়া: হারিয়ে যাওয়া।

সমকালীন: একই সময়ের।

সমন্বয় করা: মিল করা।

সর্বজনীন: সবার জন্য।

সাড়ম্বরে: আড়ম্বর সহকারে।

সৌর সন: সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসার কালপর্ব।

সৌহার্দ্যপূর্ণ: আন্তরিক।

স্থবির: গতিহীন।

স্বৈরাচারী: স্বেচ্ছাচারী।

হাডুডু: বাংলাদেশের জাতীয় খেলা।

হালখাতা: নববর্ষে ব্যবসায়ীদের নতুন হিসাবের খাতা খোলার অনুষ্ঠান।

প্রবন্ধ বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের প্রবন্ধে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

প্রবন্ধের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

প্রবন্ধ কী

প্রবন্ধ হলো এক ধরনের সুবিন্যস্ত গদ্য রচনা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়; যেমন–ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি। এই বইয়ের 'পিরামিড' লেখাটি ইতিহাস বিষয়ক, 'জগদীশচন্দ্র বসু' লেখাটি বিজ্ঞান বিষয়ক, 'কত কাল ধরে' লেখাটি সমাজ বিষয়ক এবং 'বাংলা নববর্ষ' লেখাটি সংস্কৃতি বিষয়ক।

ধরন অনুযায়ী প্রবন্ধ নানা রকম হতে পারে; যেমন: বিবরণমূলক প্রবন্ধ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি। বিবরণমূলক প্রবন্ধে কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়, তথ্যমূলক প্রবন্ধে মূলত তথ্য তুলে ধরা হয়, আর বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধে উপাত্ত ও তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়।

যিনি প্রবন্ধ লেখেন, তাঁকে বলা হয় প্রাবন্ধিক বা প্রবন্ধকার। প্রবন্ধের মধ্যে সাধারণত আবেগের চেয়ে যুক্তি প্রাধান্য পায়। বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রবন্ধের প্রথম অংশ ভূমিকা নামে পরিচিত। ভূমিকায় মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে। প্রবন্ধের শেষ অংশ উপসংহার নামে পরিচিত। উপসংহারে প্রাবন্ধিকের সমাপ্তিসূচক মন্তব্য থাকে।

প্রবন্ধ লিখি

প্রবন্ধ লেখার জন্য কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করো। বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে আলোচনা করবে, তা প্রথমে কাগজে টুকে রাখো। এবার আলোচনার দিকগুলো সাজিয়ে নিয়ে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে গদ্যভাষায় বিষয়টি উপস্থাপন করো। লেখার উপরে একটি শিরোনাম দাও।

____

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

যাচাই করি

প্রবন্ধ লেখা হয়ে গেলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করো:

১. প্রবন্ধটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা? (ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি)

....

....

....

২. প্রবন্ধটির ধরন কী এবং কেন? (বিবরণমূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক) ....

....

....

....

....

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাটক

মামুনুর রশীদ ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে আছে 'ওরা কদম আলী', 'এখানে নোঙর', 'মানুষ' ইত্যাদি। নিচে মামুনুর রশীদের একটি নাটক দেওয়া হলো।

নাটকটি প্রথমে মনে মনে পড়ো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী একেক জন একেকটি চরিত্রের সংলাপ পাঠ করো।

সেই ছেলেটি

মামুনুর রশীদ

১ম দৃশ্য

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই গান গাইতে গাইতে স্কুলে যাচ্ছে। যেন তাড়া তাদের। একসময় হঠাৎ থেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর পায়ে ব্যথা । সাবু ফিরে আসে।)

সাবু : কী হলো আবার?

আরজু : আমি যে আর হাঁটতে পারছি না!

সাবু : রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না।

আরজু : ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এক্ষুনি যাব।

সাবু : থাক তাহলে।

(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়ালা।)

আইসক্রিমওয়ালা : আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ?

আরজু : কিছু না।

আইসক্রিমওয়ালা : স্কুলে যাবে না?

আরজু : না।

আইসক্রিমওয়ালা : স্কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব স্কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দেখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও স্কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।

আরজু : ভাই শোনো–তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?

আইসক্রিমওয়ালা : আমি তো যাব ঐ বাজারের দিকে।

আরজু : আজ স্কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময়।

আইসক্রিমওয়ালা : ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম।

(আইসক্রিমওয়ালা চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)

আরজু : ভাই শোনো।

হাওয়াই মিঠাইওয়ালা : শুধু শুধু ডাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

আরজু : তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়াই মিঠাইওয়ালা : হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা–তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই–চাই হাওয়াই মিঠাই। (চলে যায়)

আরজু : এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে স্কুলে ফাঁকি দেওয়ার মতলব–স্কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। এখন কী হবে?

২য় দৃশ্য

(টিফিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও অন্য ছেলে-মেয়েরা টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন শিক্ষক লতিফ স্যার।)

লতিফ স্যার : এই সাবু, এদিকে শোনো–আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?

সাবু : স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এ রকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।

লতিফ স্যার : কিন্তু কেন করে?

সাবু : এমনিই।

লতিফ স্যার : এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?

সাবু : জানি না স্যার।

লতিফ স্যার : আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই স্কুল কামাই করছে?

সোমেন : স্যার, ওর যে কী হয়! হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?

লতিফ স্যার : কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।

মিঠু : স্যার ঐ ছেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।

লতিফ স্যার : কোথায়?

মিঠু : ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।

লতিফ স্যার : নানা কথা? তাহলে স্কুলে এল না কেন?

মিঠু : একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না–এখন বাজারে যাব। তারপর টিফিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলে যাব।

লতিফ স্যার : তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আচ্ছা ঐ আমবাগানে কি এখনও আছে?

সোমেন : মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।

লতিফ স্যার : তোমরা চলো তো–

সাবু : স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা হেঁকে চলেছে–হাওয়াই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওনা দেন।)

৩য় দৃশ্য

(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

আরজু : পাখি, একটু নিচে নামো না! তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না! তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছো? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব–তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোটো পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না–চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না–শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কাঁদতে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)

লতিফ স্যার : আরজু, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাওনি কেন?

সোমেন : কাঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কাঁদছেই)

লতিফ স্যার : কোনো ভয় নেই, বলো।

আরজু : স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।

লতিফ স্যার : তোমার বাবা-মাকে বলোনি কেন?

আরজু : বলেছি–বাবা বলেন হাঁটাহাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

লতিফ স্যার : তোমার পা দুটো দেখি–এ তো রোগ, তোমার পা চিকন হয়ে গেছে।

আরজু : মা জানে, সেই ছোটোবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা চিকন–মা বোঝে কিন্তু কাঁদে শুধু।

লতিফ স্যার : তোমরা খেয়াল করনি?

সোমেন : না স্যার।

লতিফ স্যার : তোমাদের বন্ধু না?

সোমেন : জ্বী স্যার।

লতিফ স্যার : তোমার যদি এ রকম হতো?

সোমেন : আমরা বুঝতে পারিনি স্যার। এ রকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)

লতিফ স্যার : বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?

আরজু : স্কুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু স্কুলে যায়।)

লতিফ স্যার : চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

শব্দের অর্থ

অনুসরণ করা: লক্ষ রাখা।

অবশ হয়ে আসা: চলার শক্তি হারিয়ে ফেলা।

এক্ষুনি: এখনই।

ওয়ার্নিং বেল: সতর্ক করার জন্য বাজানো ঘণ্টা।

চন্দনা: পাখির নাম।

ফেরি করা: পথে পথে ঘুরে জিনিস বিক্রি করা।

মতলব: ফন্দি।

শালিক: পাখির নাম।

স্কুল কামাই করা: স্কুল ফাঁকি দেওয়া।

হাওয়াই মিঠাই: চিনি দিয়ে তৈরি এক রকম খাবার।

নাটকের চরিত্র

এই নাটকে যেসব চরিত্র আছে, তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ।

....

....

....

....

....

....

....

নাটক বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘সেই ছেলেটি’ নাটকে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘সেই ছেলেটি’ নাটকটির কাহিনি প্রথমে গল্পের মতো করে বলো, তারপর লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'সেই ছেলেটি' নাটকের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

'সেই ছেলেটি' একটি নাটক। নাটকের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

নাটক কী

সংলাপ-নির্ভর রচনাকে নাটক বলে। নাটক মূলত অভিনয়ের জন্য লেখা হয়।

নাটকে একটি কাহিনি থাকে। কাহিনি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

নাটকে এক বা একের বেশি দৃশ্য থাকে। নাটকের এক-একটি অংশকে দৃশ্য বলে। 'সেই ছেলেটি' নাটকে তিনটি দৃশ্য আছে। দৃশ্যগুলোর ঘটনা তিনটি জায়গায় ঘটেছে–১ম দৃশ্য: গ্রামের পাশের রাস্তা, ২য় দৃশ্য: সাবু, আরজুদের স্কুল, ৩য় দৃশ্য: আম বাগান।

নাটকে সাধারণত কয়েকটি চরিত্র থাকে। 'সেই ছেলেটি' নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে আছে–আরজু, সাবু, আইসক্রিমওয়ালা ইত্যাদি।

নাটকের চরিত্ররা যেসব কথা বলে, সেগুলোকে সংলাপ বলা হয়। 'সেই ছেলেটি' নাটকের সংলাপ: সাবু বলছে– 'কী হলো আবার?' আরজু বলছে–'আমি যে আর হাঁটতে পারছি না!'

যিনি নাটক লেখেন, তাঁকে বলা হয় নাট্যকার। যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের বলা হয় অভিনেতা। নাটকের অভিনয় যিনি পরিচলনা করেন, তাঁকে বলা হয় পরিচালক বা নির্দেশক। সাধরণত মঞ্চে নাটক অভিনীত হয়। মঞ্চের সামনে বসে যাঁরা নাটক উপভোগ করেন, তাঁদের বলে দর্শক।

টেলিভিশন ও অন্যান্য দৃশ্য-মাধ্যমে আজকাল নানা ধরনের নাটক অভিনীত হয়। রেডিওতেও নাটক শোনা যায়।

সংলাপ লিখি

যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে দুটি চরিত্রের মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

অভিনয় করি

'সেই ছেলেটি' নাটকটি কয়েকজন বন্ধু মিলে অভিনয় করো।

৭ম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের নানা রূপ

কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক—এগুলো সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রতিটি রূপের বৈশিষ্ট্য আলাদা। নিচের ছকে তুলনা করার জন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আছে। টিকচিহ্ন (√) অথবা ক্রসচিহ্ন (✕) দেওয়ার মাধ্যমে ছকটি পূরণ করো।

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	কবিতা	ছড়া	গান	গল্প	প্রবন্ধ	নাটক
১	মিলশব্দ						
২	তাল						
৩	নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইন						
৪	সুর						
৫	পদ্য-ভাষা						
৬	গদ্য-ভাষা						
৭	কাহিনি						
৮	চরিত্র						
৯	বিষয়						
১০	অনুচ্ছেদ						
১১	সংলাপ						
১২	অভিনয়						

সাহিত্যের রূপ বুঝি

উপরের ছকের ভিত্তিতে এবং তোমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক–এগুলোর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

কবিতা:

....

....

....

....

....

ছড়া:

....

....

....

....

....

গান:

....

....

....

....

....

গল্প:

....

....

....

....

....

প্রবন্ধ:

....

....

....

....

....

নাটক:

....

....

....

....

....

দেয়াল-পত্রিকা বানাই

তোমাদের লেখা কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক নিয়ে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করো। এ কাজের জন্য শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দল থেকে একটি করে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি হবে।

সপ্তম অধ্যায়

অন্যের মত বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করি

১ম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন করতে শেখা

প্রশ্ন করি

আজ স্কুল বন্ধ। সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি। রাহাত ও রেবা মায়ের কাছে বায়না ধরল খিচুড়ি খাওয়ার। তাদের মা হাসিমুখে বললেন, 'আজ খিচুড়ি আমি রান্না করব না। তোমরা রান্না করবে, আমি শুধু তোমাদের কাজে সাহায্য করব।' এ কথা শুনে রাহাত ও রেবা ভীষণ খুশি হলো। কিন্তু তাদের চিন্তা হলো, আগে কখনও তারা নিজেরা খিচুড়ি রান্না করেনি। মা ব্যাপারটিকে সহজ করে দিলেন। তিনি বললেন, 'খিচুড়ি রান্নার উপায় বুঝে নেওয়ার জন্য তোমরা কিছু প্রশ্ন তৈরি করো।' রাহাত ও রেবা খাতা-কলম নিয়ে বসে গেল প্রশ্ন তৈরি করার জন্য। এমন সব প্রশ্ন তৈরি করতে হবে, যেগুলোর জবাব শুনে খিচুড়ি রান্নার ধাপগুলো বোঝা যায়।

এবার তোমাদের পালা। তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হও। খিচুড়ি রান্নার উপায় জানতে তোমরাও প্রশ্ন তৈরি করো। প্রশ্নগুলো হতে পারে এমন–

১. খিচুড়ি রান্না করতে কী কী লাগে?

জবাব: খিচুড়ি রান্না করতে মূলত চাল ও ডাল লাগে।

২. খিচুড়ির মধ্যে কি কোনো সবজি দেওয়া যায়?

জবাব: খিচুড়ির মধ্যে সবজি দেওয়া যায়।

৩. কোন কোন সবজি দেওয়া যায়?

জবাব: আলু, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি দেওয়া যায়।

খিচুড়ি রান্নার জন্য আর কী কী প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার, সেগুলো খাতায় লেখো। এসব প্রশ্নের মধ্যে যেগুলোর জবাব জানা আছে, সেগুলো প্রশ্নের নিচে লেখো।

প্রশ্ন করি জবাব খুঁজি

এখানে আরও কিছু বিষয় দেওয়া হলো। এগুলোর সমাধানের জন্য তোমাদেরকে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। দলে ভাগ হয়ে একেকটি বিষয়ের জন্য প্রশ্ন তৈরি করো। আলোচনা করে জবাবও খুঁজে বের করো।

নতুন কোনো জায়গায় যাওয়া

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

বনভোজনের ব্যবস্থা করা

ছবি দেখে আলোচনা করি

দলে ভাগ হও। নিচের ছবিগুলো দেখে কী বুঝতে পারছ, তা দলে আলোচনা করো। আলোচনা শেষ হলে দলের একজন সবার সামনে দাঁড়িয়ে বিষয়টি নিয়ে দুই মিনিট কথা বলবে। তার কথার গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্যরা খাতায় টুকে রাখবে। এবারে অন্য দলের শিক্ষার্থী পূর্ববর্তী দলের অভিমতের সাথে একমত না হলে তাদের নিজেদের যুক্তি উপস্থাপন করবে।

২য় পরিচ্ছেদ

সমালোচনা করতে শেখা

নিজের মত দেই এবং অন্যের মত শুনি

তোমাদের পাঠ্যবইয়ে নানা রকমের পাঠ আছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে এমন দুটি পাঠ সম্পর্কে তোমার অভিমত দিতে হবে। অভিমত দেওয়ার আগে নিচের ছকে ভালো লাগার কারণগুলো লেখো।

পাঠের শিরোনাম	ভালো লাগার কারণ
	১. ২. ৩.
	১. ২. ৩.

ভালো লাগার কারণগুলো লেখা হয়ে গেলে সেই অনুযায়ী সবার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার অভিমত দাও। এই অভিমতের সঙ্গে কেউ একমত হতে পারে, আবার কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারে। সবার ভালো লাগার কারণ ও যুক্তি একরকমের হয় না। অভিমতের মধ্যে বিবরণ, উদাহরণ ও যুক্তি থাকে। অন্যদিকে, কারো মত খণ্ডন করার জন্য যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হয়। অন্যের মতের ইতিবাচক অংশকে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা দরকার। যুক্তিযুক্ত যে কোনো মত গ্রহণ করা যায়।

পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিই

জাবের আলি একজন কৃষক। কৃষিকাজ করেই জাবের আলি পুরো জীবনটা কাটিয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে। বড়ো ছেলে গ্রামে বাবার সাথে কৃষিকাজ করে। আর ছোটো ছেলে শহরে চাকরি করে। এ বছর ধান ভালোই হয়েছে। বড়ো ছেলে এতে ভীষণ খুশি। কিন্তু ছোটো ছেলে জানাল, মুরগির খামারে লাভ অনেক বেশি। সে তাদের চাষের জমিতে একটি মাছ ও হাঁস-মুরগির খামার করতে চাইল। বড়ো ছেলের মতে, ধানের আবাদ বেশি সুবিধাজনক। কারণ, এই ধান তাদের সারা বছরের খোরাকি জোগায়। তাছাড়া ধান বিক্রি করে তাদের সংসারও চলে। ছোটো ছেলের মতে, যদি খামার করা যায়, তবে সেখান থেকে প্রচুর নগদ টাকা পাওয়া যাবে। সারাবছরের সংসার চালানোর মতো খরচও পাওয়া যাবে। বড়ো ভাই জানাল মুরগির খামার করা হলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে। তাছাড়া মুরগির নানা রকম রোগবালাই আছে। ছোটো ভাই জানাল, ধান চাষ করে সংসারের বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাছাড়া ধান গাছেরও তো নানা রকম অসুখ আছে।

আগের পৃষ্ঠার দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের যুক্তি তোমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। তুমি এদের মধ্যে কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করো। সেই পক্ষের সমর্থনে তোমার যুক্তি দাও। অন্য পক্ষের যুক্তিও তোমাকে খণ্ডন করতে হবে।

ক্রম	পক্ষের যুক্তি	অন্য পক্ষের যুক্তি খণ্ডন
১		
২		
৩		

যুক্তি প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন করার সময়ে নিচের কথাগুলো মনে রাখবে:

১. নিজের কথা ও যুক্তি কাগজে টুকে রাখতে হয়;
২. নিজের পক্ষের যুক্তিগুলো একে একে তুলে ধরতে হয়;
৩. নিজের যুক্তির পক্ষে উদাহরণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়;
৪. নিজের কথা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলতে হয়;
৫. অন্যের কথা ও যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়;
৬. অন্যের বক্তব্যের দুর্বল অংশ খুঁজে বের করতে হয়;
৭. বিনয়ের সঙ্গে অন্যের যুক্তি খণ্ডন করতে হয়;
৮. অন্যের কথার মাঝখানে কথা বলা যায় না।

বিতর্ক করি

বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষক তোমাদের জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। এরপর প্রতি জোড়া দলের জন্য একটি করে বিতর্কের বিষয় ঠিক করে দেবেন। বিষয়টির পক্ষে এক দল বলবে এবং বিপক্ষে অন্য দল বলবে। প্রতি দলে একজন দলনেতা থাকবে। কথা বলার সময়ে প্রমিত ভাষার ব্যবহার করতে হবে। যুক্তি, পালটা যুক্তি ও ভাষা ব্যবহারে পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক বিজয়ী দল ঘোষণা করবেন।

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হয়।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অহংকার পতনের মূল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য